নাম তার রূপসী

শ্রীমন্ত

• পরিবেশক •

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

স্নেহের

মনু, দেবু, নন্দিতা, আরতি, পুতুলকে
দিলাম।

খোকা কাকা

এই লেখকের

আমি মুসাফির

স্বর্ণমৃগ

মানস-গঙ্গার পথে

(যন্ত্রস্থ)

দরবারী কানাড়া

(যন্ত্রস্থ ,

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র কাল্পনিক। যদি কোন ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রের সহিত উপন্যাসে বর্ণিত কোন চরিত্রের সাদৃশ্য ঘটে, তবে নিতান্ত আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত।

NAM TAR RUPASI

BENGALEE NOVEL

By

Sreemanta

উত্তরে নদী। তিন দিকে বিল। মাঝে চরমুকুন্দপুর গ্রাম। ছোট গ্রাম। বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশ জাতিতে হিন্দু কাহার। কয়েকঘর বাগ্‌দী আছে গ্রামের প্রান্তে। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের কয়েকটি মালো পরিবার ঘর বেঁধেছে নদীর ধারে নাবাল জমিতে।

কাহাদের জাত ব্যবসা বন্ধ। না আছে পালকির চল, না আছে শূয়োরের কারবার। যদিও কাহার পাড়ায় কুঁড়ের আনাচে কানাচে ভাঙা পালকির কাঠ-কুটো নজরে পড়ে।

শুধু একটি পালকি আছে মোহন্তর। বৃদ্ধ মোহন্ত কাহার যত্ন করে রেখেছে সেটিকে। ওই পালকির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওর অতীত জীবনের স্মৃতি। রায়হাটের দত্তবাবুরা যখন দেশ ছেড়ে চলে যান, তখন তাঁদের খাস বেহারা মোহন্ত কাহারকে দিয়ে যান নক্সা-কর সেগুন কাঠের পালকি। বাবুরা বলতেন—ওটা আসল বর্মা সেগুনের তৈরী। হবেও বা। সোনাতলির দাশুমিস্ত্রী একবার পালকিটা কিনতে চেয়েছিল। দাম বলেছিল একশ' টাকা। সেবার পঞ্চাশের মন্বন্তরের বছর। পেটে ক্ষিদে নিয়েও পালকিটা ঘরে রেখেছিল মোহন্ত।

মোহন্ত গ্রামের প্রাচীন মানুষ। দিন সালের হিসেব নেই, আন্দাজে মনে হয় একশ' বছর পেরিয়ে গেছে। একটি শতাব্দীর চাকা ঘুরতে দেখেছে মোহন্ত। তাই নিয়ে ওর গৌরব। বলতো—অনেক দেখেচি, অনেক ছ্যাখপো। আজকাল আর ও কথা বলে না। বলে—পেরানডা গেলে বাঁচি। বলেই করুণ হাসি হাসে।—মরা বললেই তো আর মরা যায় না, যম ব্যাটা বড়ো পাজী।

সত্যি, আর বাঁচতে চায় না মোহন্ত। কি নিয়ে বাঁচবে? বৌ-ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী—সব গেছে একের পর এক। মরাটা যেন তাদের পক্ষে সহজ ছিল। তাই মরতে পেরেছে। মোহন্তর বিশ্বাস, ভগবান আরো কিছুদিন ওকে বাঁচিয়ে রাখবেন। তাছাড়া

মোহন্তকে যে এখনো বেঁচে থাকতে হবে। অন্ততঃ যতোদিন না রূপোর বিয়ে হয়। রূপো ওর নাতনী। ছোট ছেলের মেয়ে। মোহন্তর বংশে ওই এক চিলতে সলতে। ছ' বছর বয়েস থেকে দাদুর কোলে-পিঠে মানুষ হয়ে উনিশে পা দিয়েছে। রূপোর রূপ আছে, আছে অনেক গুণ। অমন মেয়েকে কি যার তার হাতে তুলে দিতে পারে মোহন্ত? নয়তো রূপোকে পাবে বলে তো অনেক ছেলে হাত বাড়িয়ে বসে আছে। আর, ও মেয়েও চায় না যাকে তাকে বিয়ে করতে। বলে—আমি বে করবো না। শ্বশুব বাড়ী গেলে তোমারে ছ্যাখপে কেডা! রূপোর কথায় মোহন্তর মুখে ফুটে ওঠে শতাব্দীর পুরোনো হাসি। কুঞ্চিত হয়ে ওঠে মুখের চামড়া।

চরমুকুন্দপুরের ইতিহাস মোহন্ত জানে। বায়হাটের দত্তবাবুরা মলায় জিতে এই চরের মালিকানা স্বত্ব পেলেন। তার আগে ছল জিরিকপুরের বিশ্বাসদের। মুকুন্দ দত্তর নামে হলো এই চরের নাম। আগে কি নাম ছিল না ছিল তা মোহন্ত জানে না।

দণ্ডীরহাটের কাহাররা দত্তবাবুদের অনুগত প্রজা। এ চর তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন দত্তবাবুরা। মোহন্তর স্পষ্ট মনে আছে, এই চরে যখন বাপের সঙ্গে আসে তখনকার কথা। ও তখন বয়স দশ বারো বছর হবে। প্রথমে দণ্ডীরহাটের কাহাররা এই চরে বসতি স্থাপন করেছিল। তারপর আসে আশাশুনির বাগদীরা। পূর্ববঙ্গের মালোরা তো হালে এসেছে।

মোহন্ত দেখেছে কতযুগের উত্থান-পতন। এখনো দেখছে। দৃষ্টি আছে, আরো দেখবে। দেখতে দেখতে একদিন শেষ হয়ে যাবে। মোহন্তর চোখের সামনে কতো উজীর ফকির হয়েছে, কতো উজীর রাজা হয়েছে। জিবিকপুরের বিশ্বাসদের কি না ছিল। অতো নগদ টাকা এ তল্লাটে কারো ছিল না। কিন্তু সব উবে গেল কর্পূরের-মতো। ভাগ্যের ওপর কারো কায়েমী স্বত্ব নেই। মামলা মোকর্দমা করে উৎসন্ন হলো। যে ভিটেয় বারো মাসে তের পার্বণ হতো, সে ভিটেয় ঘুঘু চরতে দেখেছে মোহন্ত। আর আজ

ফুলে কলা গাছ হলো রায়হাটের দত্তরা। কিন্তু তাও বা কদিন। গরমে ইস্পাত গলে যায়, পাপে ফলন্ত গাছ শুকিয়ে যায়। মোহন্তর চোখের সামনে ফেঁপে উঠলেন দত্তবাবুরা। আবার চুপসে গেলেন। অতো রংবাজী করলে তার পরিণাম ওই রকম। শুধু মেজো তরফ চারু দত্ত ডুবতে ডুবতে ডাঙায় উঠেছিলেন। দেখে শুনে দেশের জমিজমা বিক্রি করে কলকাতায় চলে গেলেন। আর শরিকেরা মরে হেজে কে কোথায় গেছে, কে জানে। এখন আছে অনন্ত দত্ত। বড়ো তরফের নাতি। ইঁট কাঠের স্তূপের মধ্যে ছোটো একখানা দোচালা কুঁড়েয় থাকে। পুরোপুরি পাগল না হলেও পাগলের মতো। ওই অনন্তর অন্নপ্রাশনের দিন মোহন্ত একা বিশ মণ মাছের আঁশ ছাড়িয়ে ছিল। সে সব কথা আজ গল্প কথা।

চরমুকুন্দপুরের মানুষ এইসব গল্প শুনতে আসতো মোহন্তর কাছে। এখনও আসে। রাতে বিছানায় শুয়ে এখনো মোহন্ত গল্প শোনায় রূপোকে। ছোটবেলায় দাদুর বলা গল্প কথা শুনতে ভালো লাগতো রূপোর। এখন পানসে মনে হয়।

এতো বয়স হয়েছে, তবু সূর্য ওঠার আগে ঘুম ভাঙে মোহন্তর। ভোরে উঠে বেড়ানোটাও অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। বাঁশের লাঠি হাতে এখনো ভোরে উঠে এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে আসা চাই। বেড়িয়ে এসে দরকার একথালা পান্তা আর তেঁতুল গুড়। ক্ষিধে সহ্য করতে পারে না মোহন্ত। রূপো ঠিকই যুগিয়ে যাচ্ছে। মোহন্ত জানে, লক্ষ্মীর ঘরে কখনো ভাতের অভাব হবে না। মাটি আছে যখন —মা আছে, তখন অভাব কিসের। আজ না হয় মোহন্ত একরকম অক্ষম হয়ে পড়েছে, কিন্তু এমন তো ছিল না। দত্তবাবুদের দেওয়া চার বিঘে লাখেরাজ জমি। ভিটে বাড়ীর সংলগ্ন। ওই জমিতে সোনার ফসল ফলাতো মোহন্ত। এতোদিন ফসল দিচ্ছে ওই মাটি, কোনদিন কার্পণ্য করেনি। মাটি যেন লক্ষ্মী ঠাকরুণ। রূপো মেয়ে নয়, যেন ছেলে। নয়তো জন-মজুর না নিয়ে নিজের হাতে চাষ-বাস করে কি ভাবে? কেনই-বা করবে না, ও যে মোহন্তর নাতনী!

কাহারপাড়ার মধ্যে মোহন্তর যা সামান্য জমিজমা আছে, আর কারো এমন কিছু নেই। অধিকাংশের ভরসা দিনমজুরি। আজকাল কেউ কেউ মজুরি না খেটে শহরে গিয়ে সাইকেল রিক্সা চালাতে আরম্ভ করেছে, দু'একজন হাটে বাজারে তরি-তরকারীর ব্যবসা করে না এমন নয়। ব্যতিক্রম রসিক কাহারের ছেলে সুজয়। চা আর পান-বিড়ির দোকান করেছে বসিরহাটের হাটখোলায়। খরচ-খরচা বাদে যা হোক দু'পয়সা ঘরে আনতে পারছে।

সুজয়ের কথা মনে পড়লে রূপোর মন আনচান করে ওঠে। দেহের মতো মনেরও ক্ষুধা আছে। দেহের ক্ষুধার চেয়ে সে ক্ষুধা আরো তীব্র। আগে বুঝতো না রূপো। আজকাল বোঝে। জানে, একমাত্র সুজয় পারে ওর মনের ক্ষুধা মেটাতে। সুজয় কতো সুন্দর। আর কি জঘন্য ওই সুদাম মালো। বিশ্রীও। ঘাড় চাঁচা বাবরী চুল, বাবুই পাখীর মতো। চোখ দুটি সবসময়ের জন্যে টকটকে। হয়তো নেশা করে। সুদাম মালো ছিনে জোঁকের মতো যখন তখন ঘুর ঘুর করে রূপোর পেছনে। আজ সকালেও রূপোর বাড়ীর সামনে বাবলা গাছতলায় দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছিল। জোঁক। ছিনে জোঁক। দেখলেই গা শির শির করে করে ওঠে ঘৃণায়।

গোধূলিবেলা। জলভরা মেটে কলসী ছাঁচতলায় নামিয়ে রেখে রূপো আপন মনে বলে ওঠে—মার ঝাড়ু।

—কারে ঝাড়ু মারবি রে রূপো? দাওয়ার খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে তামাক খাচ্ছিল মোহন্ত। বলে—তার নামডা কি শুনি?

—ও কিছু না।

—না। কিছু না আমি যেন কিছু বুঝিনে। মোহন্ত আত্মতৃপ্তির সুরে বলে—শোন, আমি এমন একডা মানুষ, যে নিজে তালের আঁটি পুঁতে সেই গাছের তাঁল খাইচি।

রূপো কোনো কথা বলে না। কথা বললেই কথা বাড়বে। শুধু বলার সুযোগ পেলেই হয়। গল্পের বোঁচকা খুলে বসবে দাদু।

আদিকালের গল্প। তাই না দাঁড়িয়ে রান্না ঘরের ভিতর চলে এলো।

—অ রূপো, রসিক আশ নেমন্তন্ন করে গেচে, সত্যনারানের ছিন্নি হবে। আমি যাবো না! তুই পাত্তর নে যাস। একটু পেরসাদ নে আসিস। বলে মোহন্ত হাঁক দেয়—অ রূপো, শুনতিছিস্। বলি অ রূপো—সুজয় বাড়ী এয়েচে।

সুজয় বাড়ী এসেছে? কই, এ খবর তো পায়নি রূপো। কিন্তু এখানে এলো না কেন? যখনই আসে রূপোর সঙ্গে দেখা করে তবে বাড়ী যায়। অভিমানে গুমরে ওঠে রূপোর মন। সুজয় যে ওর মনের মানুষ। মনে মনে সে তাকে বরণ করেছে পতিত্বে। কেউ না জানুক, হয়তো সুজয়ও জানে না। কিন্তু রূপো জানে তার মনের মানুষ ওই সুজয়।

মোহন্ত হুঁকো টানতে টানতে আসে রান্নাঘরে। উনুনে ভাত চাপিয়েছে রূপো। মোহন্ত জিজ্ঞাসা করে—কি বললাম শুনিচিস্?

—শুনিচি গো শুনিচি। আমি কেন, তুমি যেয়ো'খন।

—রেতের বেলা ভালো ঠাওর পাইনে। শেষটা কম্‌নে খানা-খন্দয় পড়ে যাবানে। এমনি মরণ হয় ভালো। তা বলি অপঘাতে মরতি পারবো না। বলে মোহন্ত পাতার আঁটির ওপর বসে।—তা রাঁধবি কি?

—কাঁকড়া চচ্চড়ি ভাত! তুটো খেসারীর ডাল ভাতে দেবানে।

—কাঁকড়া পেলি কমনে?

—বাগ্‌দী পাড়ার রতন দে গেচে। সেদিন তু'সের ঝিঙে নে গিছিলো, তাই নগদ পয়সা না দে ছ'টা কাঁকড়া দেছে।

—অনেক দিন নোনাগুলে খাইনি রূপো। তোর দিদি থাকতি, জিবে চুক্ শব্দ করে মোহন্ত বলে, সে বড্ড ভালবাসতো নোনাগুলে।

এবারে শুরু হবে মোহন্তর গল্প বলা। ছোটবেলায় দাতুর গল্প শুনতে খুব ভালো লাগতো রূপোর। রূপকথার মতো। সে সব

গল্প মুখস্থ হয়ে গেছে ওর। এখন দাত্বর মতো অনর্গল বলে যেতে পারে। বলেও। পাড়ার কচি ছেলেমেয়েরা প্রায়ই আসে রূপোর কাছে গল্প শুনতে। তারা অবাক হয়ে শোনে, আর রূপো গল্পের পর গল্প বলে চলে।

দাত্বর গল্প শুরু হলো—জানিস, সেবারে দত্তবাবুদের মেজ তরফের ছেলের অন্নপেরাশন। বাড়ীর বৌঝিরা জল সইতে যাবে। কলকেতা থেকে ব্যাঁকপাই বাজনা এয়েচে। সানাইদার এয়েচে। সেকি বাজনার তোড়। বৌঝিরা সব পায়ে হেঁটে যাবে। ছোট গিন্নী বায়না ধরলেন, তিনি হাঁটতি পারবেন না। পালকি চাই। বড়বাবু অমনি হুকুম করলেন—মোহন্ত, পালকি বের কর। আর কি। না করার উপায় নেই।

মোহন্তর গল্প শেষ হয় না। ভাত হয়ে গেছে। কড়ায় কাঁকড়া চচ্চড়ি চাপিয়ে গল্প শুনছে রূপো।

জল সইতে যাচ্ছে দত্ত বাড়ীর মেয়েরা। আগে চলেছে বাজনদার, তারপর ঝি চাকরানীরা পসরা মাথায়। তারপর বাড়ীর বৌঝিরা। সব শেষে পালকি চেপে চলেছেন ছোট-বৌ। আটজন বেহারা কাঁধ দিয়েছে। খাস বেহারা মোহন্ত, পাশে পাশে চলেছে। হাঁক দিচ্ছে—হেঁই—ও-ও-হো-হো। আটজন বেয়ারার কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি।

বাড়ীর সব মেয়ে-বৌ এসেছে পায়ে হেঁটে, আর ছোট-বৌ পালকি চেপে। এই নিয়ে কথা উঠলো পাড়ার মেয়ে মহলে। কিন্তু বড়লোকের বাড়ীর ব্যাপার, প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে সাহস করলো না।

আগুন জ্বালানো রূপ ছিল বাবুদের ছোট গিন্নীর। হাদিপুরে মল্লিকবাড়ীর মেয়ে; তাই অতো গ্যাদা। মোহন্ত টিপ্পনি কাটে—হলোও তেমনি।

—কি হলো?

—বড়োলোকের বাড়ীর কেলেঙ্কারীর কথা কতো শুনবি

ছোটো কত্তা বাড়ী থাকতেন না সব সময়। কোলকাতায় সাহেব-দের সঙ্গে কারবার করতেন কিনা! বিরাট কারবার। জাহাজ বোঝাই করে মাল চালান দেতেন ছোটবাবু। ইদিকে জমিদারী, ওদিকে অত বড়ো কারবার। টাকায় ছ্যাৎলা পড়ে গেল। ছোট গিন্নী ইদিকে—বলে চুপ করলো মোহন্ত।

—কি, বলো।

—সে লজ্জার কথা শুনে কি করবি। সদর নায়েবের ছেলের সঙ্গে গোপনে ভাব-ভালবাসা করতি লাগলো ছোট গিন্নী। কাত্তিকের মতন চেহারা সে ছোঁড়ার। বলি, পাপ কি ঢাকা থাকে। লোক জানাজানি হয়ে পড়লো। ছোটবাবু এমনিতে ঠাণ্ডা মনিষ্যি, কিন্তু রাগ হলি একেবারে রাহু। বৌরে কম ভালবাসতেন না ছোটবাবু। দত্তবাড়ীর সোহাগী বৌ। সেই বৌয়েরে গলাধাক্কা দে ছোটবাবু বাড়ীর বার করে দেলেন। শুনিছি বাপের বাড়ীতেও জায়গা হয়নি তেনার। আর নায়েবের ছেলে তো রাতারাতি নিরুদ্দেশ হলো। বলে মোহন্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে।

এ গল্প এর আগে কোনদিন শোনেনি রূপো। তাই আগ্রহ ভরে শুনছে। জিজ্ঞাসা করে—ছোট গিন্নীর কি হলো তারপর?

—হবে আবার কি! অমন যার রূপ তার কি জায়গার অভাব? চলে গেল কোলকেতায়। থ্যাটার করতি লাগলো। শুনিছি কোলকেতায় নাকি খুব নাম হইছিল। ছোটবাবুও নাকি সেই থ্যাটার দেখতি যাতেন গোপনে। হাজার হোক ইস্তিরি তো। সে যাই হোক্, ছোট বৌ-এর পাপেই বাবুদের বাড়ীতে শনি ঢুকলো। লজ্জায়, দুঃখে ছোটোবাবু মদ খাতি আরম্ভ করলেন। বড়বাবু দেহ রাখলেন। আর সেজবাবু তো থেকেও নেই। জোয়ারের জলে লোনা নদীর পাড় ভাঙ্গে। এও তেমনি। বাড়ীর ছেলেরাও গোল্লায় গেল। যে দালানে দোল দুগ্যোচ্ছব হতো, সেখানে হতি লাগলো বাইজীর নাচ-গান। বলি অতো অনাচার সইবে

কেন। দেখতি দেখতি সব উড়ে পুড়ে ছয়লাপ হয়ে গেল। এ সব শোনা কথা না, নিজের চোখে দেখিচি।

রূপোর রান্না শেষ হয়েছে। মোহন্ত এক কলকে তামাক সেজে নিয়ে মৌজ করে বসেছে বড়ো ঘরের দাওয়ায়। রূপো যাবে সুজয়ের বাড়ী। প্যাঁটরা থেকে বার করেছে দামী শাড়ী। দাদুর আমলের শাড়ী। দত্তবাবুদের বাড়ী থেকে বকশিস হিসেবে পাওয়া। শাড়ীটা আঁটসাঁট করে পরেছে রূপো। ভিন গাঁয়ের বাবুপাড়ার মেয়েরা যেমন করে পরে। নিজে নিজে কি কায়দা খোঁপা বাঁধা যায়? তবু ফুলেল তেল মাথায় দিয়ে পারা চটা আরশীর সামনে বসে যত্ন করে খোঁপা বেঁধেছে। এতো সাজ, সবই সুজয়ের জন্যে।

—একা যাতি পারবি তো?

—খুব পারবো। চাঁদনী রাত, দিনের মতো।

এ-পাড়া আর ও-পাড়া। পাঁচ সাত মিনিটের পথ। রূপো এলো সুজয়ের বাড়ী। সামনের উঠোনে অনেক লোকের ভিড়। শুধু কাহারপাড়া নয়, মালোপাড়া, বাগ্‌দীপাড়া থেকে এসেছে অনেকে। মাচানের খুঁটিতে ঝুলছে হ্যাজাক। দাওয়ার ওপর দু'টি কারবাইডের আলো। সুজয়ের বাবা রসিক কাহারের মুখোমুখি হলো রূপো। সদর দরজা দিয়ে ভিতরে যাওয়ার উপায় নেই। পুরুষ মানুষের ভিড়। খিড়কী দিয়ে যাবে বলে মাচানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো মালোপাড়ার সুদামকে দেখে। ছিনে জোঁকটা এখানে কি করছে!

—এই রাতে একা আসতে পারলে? বলে সুদাম রূপোর পথ আটকে দাঁড়ায়।

—আরে, বলে অবজ্ঞা সূচক ভঙ্গী করে রূপো হনহনিয়ে চলে যায় সুদামের পাশ কাটিয়ে। শুনতে পায় সুদামের কথা—খুব যে ফুলেল তেল মাখা হয়েছে!

রূপো এসেছে। রূপো নয়, রূপসী। সার্থক নাম ওর। অন্দরে

মেয়েরা জটলা করছিল। গুঞ্জন ওঠে রূপো আসতে। এগিয়ে এলো সুজয়ের ছোটো বোন টগর। রূপোকে হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরে।

—এই আমি তোর কথা ভাবতিছিলাম ; এতো দেরী করলি ? ভাবলাম, তুই আসবি নে। টগর আরো কিছু বলে রূপোর কানে কানে। তারপর ডাকে দাদাকে।

—দাদা, ও দাদা, দেখে যাও কেডা এয়েচে।

সুজয় রয়েছে পাশের ঘরে। সেখান থেকে উত্তর দেয়—কি, অতো চেঁচাচ্ছিস কেন ?

—আয়, ও ঘরে যাই। দাদা একা রয়েছে।

—ধ্যেৎ। বলে রূপো লজ্জায় নুয়ে পড়ে।

টগর আর রূপো। একবয়সী না হলেও ওরা সমবয়সীর মতো। গলায় গলায় ভাব। টগর আগে দিদি বলেই সম্বোধন করতো রূপোকে। আজকাল তুই তোকারিতে পৌছেচে।

টগর জিজ্ঞাসা করে—খুব যে সাজগোছ করিচিস্। বাহারে শাড়ী, নক্সা কাটা বেলাউজ, গন্ধ তেল—বলি, কার জন্যে এতো !

—তুই যেন বোকা ! টগরের গলা জড়িয়ে রূপো অনুচ্চ কণ্ঠে বলে—নেকি মেয়ে। কিছু জানে না।

—আমি কি করে জানবো বল।

—থাক, আর ধ্যানাচি করতি হবে না।

সুজয় এলো। এসেই থমকে দাঁড়ায় রূপোর মুখের দিকে চেয়ে। চোখে [illegible] পড়তে মাথা নীচু করেছে রূপো।

—আমি ভাবলাম এ আবার কাদের মেয়ে ! সুজয়ের কথায় লজ্জা পায় রূপো। ভাবে, এমন সাজগোজ করে না এলেই হতো। হয়তো কি ভাবছে সুজয়।

—লজ্জাবতী লতা ! একেবারে মাটিতে মিশে গেলি যে বলে টগর আঙুলের মৃদু টোকা দেয় রূপোর চিবুকে।—নে মুখ তোল।

—তোমারে ঠিক বিয়ের কনের মতো দেখাচ্ছে রূপো। দাঁড়াও, কালই দাদুকে বলবো। এ মেয়ে আর ঘরে রাখা যায় না।

সুজয়ের কথায় রূপোর মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে! কপালে জমে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বুকের মধ্যে যেন ঢেকীতে ধান ভানছে। টিপ টিপ করছে বুক।

—আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি।

শুধু মুখের কথা নয়, সত্যি চলে গেল সুজয়।

আগের মতো নেই সুজয়। বদলে গেছে হাল চাল। শহরের হাটখোলায় দোকান করার পর থেকে পরিবর্তন এসেছে। তাও একদিনে নয়। যদিও কোনোদিন গাঁয়ের দশজনের মতো ছিল না ও। ওর প্রকৃতি বরাবরই ভিন্ন ধরনের। ওর তিন কুলে কেউ লেখাপড়া শেখে নি। অথচ ওই ছেলে শিশুকালে বায়না ধরতো বই পড়বে বলে। গাঁয়ে না ছিল পাঠশালা, না ছিল কোনো গুরুমশায়। ডাকাতমারির বিলের ওপারে নলকুঁড়ো গ্রাম। শিক্ষিত মানুষের বাস সেখানে। স্কুল, পাঠশালা আছে। চরমুকুন্দপুরের চারপাঁচটি ছেলে যেতো বই শ্লেট বগলে করে নলকুঁড়োর পাঠশালায়।

এ তল্লাটের কাহার সম্প্রদায়ের পুরুত নরুঠাকুর। নলকুঁড়োয় বাড়ী। সদাশিব মানুষ। যখনই আসতেন চরমুকুন্দপুরে, তখনই সুজয়কে নিয়ে বসতেন। সুজয়ের বাবাকে ডেকে বলতেন—বুঝলে রসিক, তোমার ছেলের মাথা ভালো। একে লেখাপড়া শেখাও, মানুষ হবে।

রসিক বলতো—আমাদের ঘরে আর মানুষ ঠাকুর, আমরা হলামগে দু'পেয়ে জন্তু। বাপ ঠাকুরদা পালকি বয়ে, শুয়োর চরিয়ে জীবন কাটিয়েচে, আর আমরা মরতিচি মজুরি খেটে। আর ওরা করবে মুটেগিরি।

নরু বলতেন—ওইতো তোমার দোষ। নিজেকে অতো ছোটো ভাবো কেন। কোমর নীচু করে হাঁটলে আপনা থেকে মাজা পড়ে যায়—তাতো জানো।

রসিক নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলতো—ঠাকুর, মানুষ হতি কার না ইচ্ছে করে? কিন্তু হতি পারি কই?

এরপর নরুঠাকুর অগ্রণী হয়ে চরমুকুন্দপুরে পাঠশালা খুললেন। জায়গা দিয়েছিল রসিক। নগদ টাকায় দোচালা ঘর বেঁধে দিয়েছিল মাহন্ত। এসব পনের বিশ বছর আগেকার কথা। এখন সেই দোচালা ঘরের জায়গায় পাকা ঘর করে দিয়েছে সরকার। বিনা মাইনেতে পড়তে পায় ছেলেমেয়েরা। অন্য গ্রাম থেকে পাশ করা মাস্টার এসেছে। একজন নয়, তিনজন। তবুও গ্রামের লোক এখনো বলে, নরুঠাকুরের পাঠশালা। বলবেই তো। এখনো মাইনে দিতে হয় না, তখনো কেউ নগদ পয়সা দিতো না নরুঠাকুরকে। পড়ুয়ারা পালা করে মাসে এক-একদিন সিধে সাজিয়ে আনতো। চাল ডাল কলা কচু—এইসব। গামছায় পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে যেতেন নরুঠাকুর। নলকুঁড়োর ভদ্রলোকেরা নরুকে ঠাট্টা করে বলতো—নরু পণ্ডিত!

সুজয় গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে কয়েক বছর শহরের বিদ্যালয়ে পড়েছিল। আর তিন বছর হলে নাকি একটা পাশ করতে পারতো।

পূজো এখনো শেষ হয়নি। সবে শেষ হলো সত্যনারায়ণের পাঁচালী পড়া। বেশ সুর করে পাঁচালী পড়ে বলাই ঠাকুর। শুনতে ইচ্ছে করে। নরুঠাকুরও সুর করে পড়েন, তবে এমন মধুর লাগে না। আজই প্রথম বাপের যজমান বাড়ী পূজো করতে এসেছে বলাই। আসতে ও চায় না। বলে, পূজো আচ্চা আমার ভালো লাগে না। বাবার শরীর খারাপ, তাই এসেছে আজ।

পূজো হয়ে গেছে। প্রসাদ বিতরণ করছে সুজয়। রসিক দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে ঝামেলা চুকলো। রূপো এতোসময় ঘরের কোণে বসেছিল কনে বৌ-এর মতো। লোকজনের ভিড় কমতে তবে বাইরে এলো। বলাই ঠাকুর

বসে আছে দাওয়ায়, জলচৌকীতে। রূপো প্রণাম করলো পায়ের ধূলো নিয়ে—চিনতে পারো ঠাকুর?

বলাই অন্যমনস্ক বসেছিল।—হাঁ, চিনেছি। কেমন আছো? তোমার ঠাকুর্দা কেমন আছে?

—সব খবর ভালো। আমাদের বাড়ীতে একদিন যেওনে!

—আচ্ছা যাবো।

—তুমি এখনো পুতুল গড়ো ঠাকুর! সেই একবার তোমাদের বাড়ী গিছিলাম। দেখে আইছিলাম তোমার তৈয়ের পুতুল। আমারে একটা দেবা বলিছিলে, কিন্তু দিলে না!

—মনে নেই কবে বলেছিলাম! বলাই মৃদু হাসে রূপোর মুখের দিকে চেয়ে।—পুতুল খেলার বয়েস তোমার হারিয়ে গেছে।

সত্যি পুতুল খেলার বয়স হারিয়ে গেছে রূপোর জীবন থেকে। রূপো ভাবে, মিথ্যে বলেনি বলাই ঠাকুর। পুতুলের চেয়ে আরো সুন্দর ওই সুজয়।

সুজয় দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে আলনার খুঁটি ঠেস দিয়ে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে হ্যাজাকের আলোয়। রং যেন আগের চেয়ে অনেক ফর্সা হয়েছে। চোখ দুটি কত চমৎকার। বুকটা কতোখানি চওড়া। সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে ওর মুখ, সরু গোঁফের জন্যে। রূপো অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুজয়ের দিকে। বুকটা যেন পেঁজা তুলোর মতো হালকা হয়ে যায়।

—অ মা, তোমারে এখনো পেরসাদ দেয়নি টগর। সুজয়ের মা রাজুবালা স্বভাবসুলভ খ্যানখেনে গলায় ডাকেন।—অ টগর, ইদিকে আয়।

টগর ঠাকুরঘরে ছিল। মায়ের ডাকে বাইরে আসে।—কি বলতেছো মা?

—তুই কি মেয়ে রে! রূপোরে এখনো পেরসাদ দিস নি।

—দিলেই তো চলে যেতো।

রাজুবালা এবারে রূপোর চিবুক স্পর্শ করে সস্নেহে বলে—বেশ

দেখাচ্ছে। এমন মেয়ে না হলি কি মেয়ে! অ সুজয়, চেয়ে ছ্যাখ না।

—দাদা যেন ও মেয়েকে চেনে না। টগর একবার দাদার দিকে আর বার রূপোর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি যেন কি!

—তুই চুপ কর না। সব কথায় ফোঁস করিস কেন? আয় রূপো, আমার সাথে আয়।

—ফোঁস করলাম কখন। কথা বললেই বুঝি ফোঁস করা হয়? এই রূপো, যাসনে, বলে টগর টেনে ধরে রূপোর নীলাম্বরী শাড়ীর আচল।

—তুইও আয় না আমার সাথে।

এতক্ষণে রাজুবালার মুখে হাসি ফুটলো। বলে—কি রঙ্গ করতিছিস। বুড়ো দাতুরে রেখে এয়েচে, দিন তুপুরে হতো, সে এক কথা। রাত হয়েচে এখন ওরে যাতি দে।

সুজয় হাসছিল মুখ টিপে। টগর বলে—হাসছো কি। রূপোরে বাড়ী পৌঁছে দে আসবা না।

—হাঁ, আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই!

টগর কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বলে—বেশ, আমিই না হয় যাবানে। রাতে না ফিরতি পারি, দাতুর কাছে থাকবো।

সুজয় হো হো করে হাসে।—দেখিস, ঠাকুরদা আবার তোরে ঠাক্‌মা করে না নেয় শেষটা।

রূপো প্রসাদ গ্রহণ করেছে। একটি বাটিতে নিয়েছে দাতুর জন্যে। সুজয় গল্প করছিল বলাই ঠাকুরের সঙ্গে। বলাই শুধু এ-বাড়ীর পুরুতের ছেলে তাই নয়। সুজয়ের সহপাঠী। বন্ধুও।

রূপোকে দেখে সুজয় বলে—চলো বড়মানুষের মেয়ে, তোমারে পৌঁছে দিয়ে আসি। বাব্বাঃ যে কাপড় পরেছো, চোখে ধাঁ ধাঁ লেগে যায়।

রূপো অনুচ্চকণ্ঠে জানায়—প্যাটরায় পড়েছিল, ব্যবহার না কল্লি নষ্ট হয়ে যাবে তাই পরিচি।

—বেশ করেছো! দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে সুজয় বলে—এসো।

পাশাপাশি পথ হাঁটে ছ'জনায়। সুজয় আর রূপসী। দূরের পথ নয়। এপাড়া থেকে ওপাড়া। ডাকলে ডাক শোনা যায়। এতটুকু পথ ওরা নীরবে এসেছে। বাড়ীর কাছে এসে রূপো জিজ্ঞাসা করে—কদিন থাকবা!

—কাল বাদে পরশু চলে যাবো।

এরপর আর কি কথা বলবে রূপো! কোনোরকমে বলে—আরো ছুদিন থেকে যাও না।

—না পরের লোকের ভরসায় দোকান ফেলে এসোছ, না গেলে কি চলে? 'যাক্, এবারে যেতে পারবে তো? আমি যাই।

—দাছুর সঙ্গে দেখা করবা না?

—মা, রাত হয়েছে। কাল সকালে আসবো।

বুড়ো মোহন্ত দাওয়ায় বসেছিল। সুজয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে বলে—কেডা, সুজো নাকি? ও, সুজো ইদিকে আয়।

—কাল সকালে আসবো ঠাকুর্দা।

—আরে সকালে যখন আসবি তখন আসবি। এখন দোর গোড়ায় এইচিস যখন একটু বসে যা।

এই সুযোগে রূপো অনুরোধ করে—এসো। দাছু ডাকতেছে।

—তুমি যদি ডাকো যেতে পারি।

—এসো।

সুজয় এসেই প্রণাম করে মোহন্তকে। মোহন্ত আশীর্বাদ জানায়,—সুখে থাকো। তারপর জিজ্ঞাসা করে—রোজগার পাতি হচ্ছে কেমন?

—কোনো রকমে চলে যাচ্ছে। বাজার বড়ো মন্দা। খরচা বাদ দিয়ে সত্তর আশী টাকা থাকে।

—তা বেশ, তা বেশ। আগেকার দিন হলি সত্তর আশী টাকায়

দাম কি। লোকে তখনকার দিনে পাঁচটাকা মেইনেব চাকরী করে জমিদারী কিনতো। জিরিকপুরের বিশ্বেসদেব নাম শুনেচো, হাঁড়ু বিশ্বেস, অতুল বোসেব জমিদারীতে পাঁচ টেক্‌লো মেইনেব নায়েব ছিল, সেই হাঁড়ু বিশ্বেস কি না করলে। আজকাল আবার টাকাব দাম আছে নাকি? ওতো খোলামকুচির মতো। এই ধর না আমার কথা, পেটভাতা আব সাতসিকে মেইনেয় দত্তবাবুদের বাড়ীতে কাজ করিচি। তাতে তো চলে যেতো বেশ। তারপর—

—আজ এই পর্যন্ত থাক ঠাকুর্দা। সাবাদিন খাটাখাটনি গেছে, বড় ঘুম পাচ্ছে।

—তুত্তোর ছাই ঘুম; তোদের মতো বয়সে খাটাখাটনি করলি আবাব ঘম পায় নাকি। এই ধর, আমাব বয়স তখন কুড়ি কি বাইশ। কাক ডাকা ভোবে বাবুব বাড়ীর মেজোগিন্নীরে পালকি করে নে বারাসাতে গে পৌঁছলাম সন্ধ্যের আগে। পনেরো কোরোশ পথ। পথে একঘণ্টার বেশী জিরাই নি। তু'বাব ছাড়া পাঁচবার কাঁধ বদলাই নি। পারবি তোবা? হ্যা—ভারী খাটনি দেখাচ্ছিস।

মোহন্তর কথা ফুবোয় না। সুজয় আব কি করবে, শুনছে গল্প। রূপো দবজাব কাছে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে। আব চোখের ঠ্যারায় বলছে—বেশ হয়েছে, এখন মুখ বুজে শোনো দাতুব গল্প।

—কি, শুনছিস তো আমাব কথা! মোহন্ত গলা ঝাড়া দিয়ে তাকায় সুজয়েব মুখেব দিকে। সুজয় মুখ ফিরিয়েছিল রূপোর দিকে। মোহন্ত তা দেখে একগাল হেসে বলে—যা, বাড়ী যা, কাল সকালে কিন্তু আসিস।

রূপোকে চোখ ইসারায় কি যেন বলে সুজয় চলে গেল। রূপো সত্যনারায়ণের প্রসাদ বাটি সমেত দিলে দাতুর হাতে। প্রসাদ খেতে খেতে মোহন্ত স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে বলে—সুজো ছোঁড়াডা বেশ। দেখি রসিক আশকে বলে। কেডা জানে, তোরে আবার মনে ধরবে কি না।

রূপোর মনে আনন্দ ধরে না। কিন্তু মুখে বলে—তোমার সঙ্গে এবার কিন্তু ঝগড়া হবে দাদু।

—তা হয় হোক। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে যদি সুজোর সঙ্গে ভাব হয়, হোক। বলে মোহন্ত সরল শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে আরম্ভ করে। রূপোও না হেসে পারে না। দাদুর গলা জড়িয়ে বলে—দাদু, তুমি যেন কি। নাও, ভাত খাবা চলো।

সুজয় চলে গেছে। গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিল। মোহন্ত বাড়ী ছিল না, বসে বসে রূপোর সঙ্গে কতো কথা বলেছে সুজয়। সে সব কথার মানে বোঝে না রূপো। কিন্তু একটি সহজ কথা—মনে মনে যা অহরহ বলেছে রূপো, সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি সুজয়কে। না হয় মুখ ফুটে না বলেছে। কিন্তু চোখের ভাষায় সে কথা তো অনেকবার বলেছে। তবে কি চোখের ভাষা বোঝে না সে? এতো যার বুদ্ধি, সে কি এই ইসারার ভাষা বুঝতে পারে না? হয়তো বুঝতে পেরেছে, কিন্তু প্রকাশ করে নি।

কাজে মন নেই রূপোর। ট্যাড়শ ক্ষেতে নিড়েন চালানো বন্ধ করে বসে আছে চুপচাপ। ভাবছে, গত কাল সুজয়ের সঙ্গে এতো কথা বললো, কিন্তু 'তোমারে ভালোবাসি' শুধু এই দুটি কথা বলতে পারলো না কেন?

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আবার নিড়েন চালাতে আরম্ভ করে। ভাবে আগামী কাল হাটবার। তরকারীপত্তর পাঠাতে হবে হাটে। গেল হাটে ঝিঙ্গে তোলা হয় নি। এ হাটে না তুললে পেকে যাবে। পাকা ঝিঙ্গের দাম নেই। ছিবড়ে হয়ে যায়। ট্যাড়শ তোলার মতো হয়েছে, তারপর কাঁচা লঙ্কা আর আমন বরবটি তো আছেই। জ্বর হয়েছে নিতাইয়ের। সেই হাটে নিয়ে

খায় রূপোর ক্ষেতের তরি-তরকারী। নিতাই ওর জ্ঞাতি সম্পর্কে দাদা। নিতাই-এর মতো ভালোমানুষ গোটা কাহার পাড়ায় নেই। জাল জচ্চুরী তঞ্চকতা বোঝে না। ওর ওপর ষোল আনা নির্ভর করে রূপো। বলে, নিতাইদা, তুমিই আমার বল ভরসা।

নিতাইও স্নেহ করে রূপোকে। সময় অসময়ে সুখ দুঃখের কথা রূপো ছাড়া আর কাউকে জানায় না। রূপো ওর দুঃখ বোঝে। সংসারে একা খাটিয়ে মানুষ নিতাই, পাঁচটা পেট চালাতে হয়। নিজে বিয়ে থাওয়া করেনি। পঙ্গু বাবা, মা আর দুটি নাবালক ভাই বোন নিয়ে ওর সংসার। মজুরি খেটে কি বা রোজগার ওর! দিন গেলে এক টাকা কি দেড় টাকা। জমি জমা নেই। শুধু জীর্ণ দোচালা কুঁড়ে সম্বল। রূপো ওকে যেমন পারে, সাহায্য করে। চাষের জিনিষপত্তর ছাড়া নগদ পয়সাও মাঝে মাঝে দেয়।

—ও রূপা। রূপো।—গায়ের ওপর ছেঁড়া ময়লা কাঁথা জড়িয়ে নিতাই এসেছে।

—এই তোমার কথা ভাবতিছিলাম নিতাইদা। জ্বর গায়ে এলে কেন?

—এ্যালাম পোড়া পেটের জ্বালায়। বাড়িতে একদানা চাল নেই, তাই ছুটে এলাম তোমার কাছে। ক'দিন জ্বরে পড়ে রইচি। জন মজুর খেটো মানুষের অবস্থা তো বোঝো।

—ভাইটারে কোথাও কাজে লাগিয়ে দ্যাও। ওর তো খাটবার বয়েস হয়েছে।

—তার কথা বোলো না। বললাম গোটাকতক শূয়োর পোষ। তা না পারিস, অন্য কাজ কর। কথা কানে নেয় না। আরো ওর মাথাডা খ্যালে ওই সুদাম মালো। সুদাম কেষ্ট যাত্রার দল করেছে, তাতে হতভাগা ছোঁড়া কেষ্ট সাজবে। বেশী কিছু বলতি পারি নে, মা খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করবে।

—কাজডা কিন্তু ভালো হচ্ছে না। শুনতি পাই মালোপাড়ায়

অনেকরকম কিত্যি কলাপ হয়। আব সুদাম,- ওর কথা তো জানো। পাজীর পা ঝাড়া।

—সেদিনে সুদামরে ডেকে বুঝিয়ে বললাম। কথাব জবাব দেলে না। উল্‌টে কানের কাছের শিস্ দে—চলে গেল।

হাতের নিড়েন উঁচিয়ে রূপো ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে—দিতে পারলে না দু'ঘা কষিয়ে। আমি হলি কানেব কাছে শিষ দেয়া বার কর়তাম।

নিতাই দাঁড়াতে পারছে না। ঠক্ ঠব্ করে কাঁপছে। ম্যালেরিয়ায় কাঁপুনি সহ্য করা যায না। রূপো বলে—ওই দ্যাখো, তোমারে দাঁড় কবিয়ে বেখেছি। এসো।

তিন খুঁচি চাল, গোটাকতক ঝিঙে আব নগদ আট আনা পয়সা দিয়ে রূপো বলে—কাল হাটবাব। তরকাবীপত্তর হাটে না পাঠালে নয়। তোমার তো জ্বব হয়েছে, কাউকে ঠিক করে দিওনে নিতাইদা।

—কারে আবার ঠিক করবো। তুমি ঝুড়ি ভবতি করে গুছিয়ে রেখো, আমি বেলাবেলি হাটে নে যাবানে। আর যদি ফড়ে ব্যাপারীরে ডেকে এখেন থেকে দে দিতে পারি, তাই দেবানে।

—তাই দিও। জ্বর গায়ে তোমার হাটে যাতি হবে না।

—আমি যাই রূপো। কম্প আসতেচে। দাঁড়াতে পারতিচি নে। বাড়ী যেয়ে কাঁথা মুড়ি দেই গে।

মোহন্ত আশপাশে কোথাও ছিল। দেখতে পেয়েছে নিতাইকে। —অ নেতাই, নেতাই, বলে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে আসে।

—জ্বর হয়েছে ঠাকুরদা, তিনদিন একেজ্বরি।

—বেলপাতা আর শিউলী পাতার রস খা। পেটের পুরোনো মল বেরিয়ে যাবে,- দেখবি কোথাকার জ্বর কম্‌নে পালিয়েচে যতো অসুখ, সবই পেট গরমে। তোদের হজম শক্তি নেই।

—না খেয়ে খেয়ে নাড়ী শুকিয়ে গেছে। বুঝতি তো পারো।

—তা আর পারি নে। দেশটা খানে খারাপে গেছে। তোদের

মতন বয়েসে এক থারা নোনাগুলের ঝাল চচ্চড়ি খাইচি। ধামা ভরতি তালের বড়া না খালি পেট ভরতো না। এতো খাইচি, তবু পেট গরম হয় নি। তোর ঠাকুর্দা,—অ নেতাই, তোর ঠাকুর্দা ছিল আমার চেয়ে দশ বছরের ছোটো। খুব ভাবসাপ ছিল আমাদের। দু'জনে করতাম কি জানিস ?

নিতাই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। কাঁপছে। চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। দেখে রূপো বলে—দাদু, নিতাইদারে ছেড়ে দ্যাও। জ্বর গায়ে দাঁড়াতে পারতেছে না।

—যা নেতাই, যা। খানিক পথ যেতে না যেতে নিতাইকে ফের ডাক দেয় মোহন্ত।—অ নেতাই, বাড়ী যেয়ে খানিকটা শিউলী আর বেলপাতার রস খে গে. দেখবি জ্বর পালাতে পথ পাবে না।

দিন কয়েক পর। বৃষ্টি ঝরা এক দুপুরে রূপো এসেছে টগরের কাছে। গল্পে গল্পে বেলা পড়ে গেল। তারপর চুল বাঁধতে এক বেলা। এত সুন্দর খোঁপা বাঁধতে পারে টগর, দেখবার মতো। কিন্তু দেখবে কে।

টগর বলে—তোর রূপ দেখে হিংসে হয়।

রূপো হেসে বলে—তবু যাকে চাই, তার মন পাইনে টগর।

—পাবি, পাবি! তোর মনের মানুষ কে রে!

—কি জানি ভাই। সে যে কে—তা যদি জানতাম, তবে কি এতো দুঃখ থাকতো, বলে আড়-চোখে চেয়ে কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে রূপো। টগরও তেমনি, বলে—আমি তারে চিনি, কিন্তু নাম জানি নে। কি যেন নাম তার ?

টগর হাসতে আরম্ভ করে রূপোর চুলে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে। চটুল হাসি। রূপোও কম যায় না। কৃত্রিম অভিমান প্রকাশ করে বলে ওঠে—আমি যাই। দরকার নেই খোঁপা বেঁধে।

—আমি তো তোকে ধরে রাখি নি।

এদের রঙ্গ রসিকতার মধ্যে এলো রাজুবালা। কাপড় কাচতে গিয়েছিল পুকুরে। একরাশ কলমি ডগা এনেছে কাঁধের ওপর ফেলে। এসেই জিজ্ঞাসা করে—কি গল্প করতিছিস তোরা? ধন্যি মেয়ে, গল্প করেই দিন যাবে—না? সন্ধ্যে জ্বালিস নি, চৌকাঠে জল ছড়া দিস নি।

মেজাজের ঠিক থাকে না রাজুবালার। এই হেসে কথা বলছে, পরক্ষণে মুখ গোমরা হয়ে গেল। শুধু টগব নয়, রূপোও দস্তুরমতো ভয় করে রাজুবালাকে।

রূপো বলে—যাচ্ছি মাসি।

রাজুবালা বলে—আঁধার হয়ে গেছে। তারপব বিষ্টি বাদলা—একা যাবি কেম্‌নে? বোস্, তোর মেসো আসুক।

—বিষ্টি থেমে গেছে। আর এইতো সন্ধ্যে হোলো, এখন একা যাতি পারবো।

—সোমত্ত মেয়ে, একা যাবি কিরে? মুহূর্তে বদলে যায় রাজুবালার কথার সুর। গুমোট গলায় বলে—যা ভালো বুঝিস কর। আর শোন, যাবার সময় দুটো কলমি ডগা নে যা। পেঁজ ফোঁড়ন দে ছেঁচ্‌কী করে খাস। তোর মেসো, উই এতো ভালোবাসে, একথালা ভাত খেয়ে ফ্যালে উবির তরকারী দে।

কলমি ডগা হাতে নিয়ে রূপো উঠোনে নামে। টগর বলে—দাঁড়া টেমিডে জ্বেলে দেই। অন্ধকারে যাতি পারবিনে।

—তাই দে। রাজুবালা নরম সুরে বলে—সকাল করে এসে, সন্ধ্যের আগে চলে যাবি। বিপদ হতি বেশীক্ষণ লাগে না। কোনদিক থেকে আসে তাও বলা যায় না।

রাজুবালা সত্যি কথাই বলেছে। বিপদ যখন-তখন আসতে পারে। টেমির আলোয় পথ দেখে রূপো হনহনিয়ে যাচ্ছিল। মাকুদের বাড়ী অব্দি এসেছে নির্ভয়ে। এরপর থেকে পথটা নির্জন। এ পথে সন্ধ্যের পর অনেকসময় একা যাতায়াত করেছে রূপো। ভয় করেনি। ভয় আবার [illegible] নয়, মনে। কোনোদিন যেতে আসতে ওর গা ছমছম করে নি। আজো করছে না।
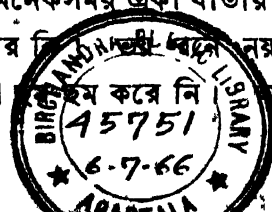
পথের পাশে বনতুলসী আর আদাড় বাঘের ঘন ঝোপ। বর্ষার জল পেয়ে বাদা হয়ে গেছে। ঝোপের মধ্যে কি যেন খস্‌খস্‌ করলো! বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে রূপোর। সাপ খোপ নয়তো? বোধহয় হাত কাঁপছিল। টেমি নিভে গেল। দাদু বলে, রাম নাম করলে ভয় পালায়। মনে মনে রাম নাম করে রূপো। অন্ধকার হলেও দ্রুত পা চালায়।

—দাঁড়াও।

—কে!

—অন্ধকার তাই চিনতে পারো নি, আমি সুদাম।

সুদাম! সুদাম মালো। সেই ছিনে জোঁক। রূপোর চোখের সামনে সন্ধ্যার অন্ধকার আরো ঘন হয়ে নামে।

—তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে রইছি সন্ধ্যে বেলা থেকে। বলে পথ আটকে দাঁড়ায় সুদাম।

সহজে ভয় পাবার মতো মেয়ে নয় রূপো। ও জানে অনেক সময় দুষ্টু কুকুরের মুখে চুমো খেতে হয়। মিষ্টি হেসে বলে—ভালোই হয়েছে! আমারে একটু এগিয়ে দেবা? একা যাতি গা ছম ছম করে।

—এ আর এমন কি কথা? তোমারে কাঁধে করে নে যেতে পারি।

—তুমি যেন কী! রাস্তা ঘাটে অমন করে বলতি আছে? কথায় বলে, গাছপালারও কান আছে।

মুখে যাই বলুক মনে সব সময় চিন্তা, যদি সুযোগ বুঝে থাবা মারে অসভ্য সুদাম। ও নামে মানুষ। আসলে হিংস্র পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। পশুকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু এদের মতো মানুষকে বিশ্বাস নেই।

রূপো পথ হাঁটতে চায় ব্যবধান বজায় রেখে। আর সুদাম ইচ্ছে করে চলছে ওর গা ঘেঁসে। একটু আধটু ছোঁয়াও লেগেছে। শিউরে উঠেছে রূপোর দেহ। অথচ কিছু বলতেও পারছে না। কি বলবে?

কথার ফুলঝুরিতে রূপো ভুলিয়ে রাখতে চায়—তুমি নাকি যাত্রার দল করেচো?

—হ্যাঁ। গর্বের সঙ্গে সুদাম জানায়, শুধু দল করা নয়, অধিকারীও নিজে। স্বয়ং রাজার পার্ট করে। কংস রাজা!

কংস রাজাই বটে। যাবপরনাই উৎসাহ প্রকাশ করে রূপো বলে:—কবে যে শুনতি পাবো! যাত্রায় ঠাকুর দেব্‌তার পালা আমার খুব ভালো লাগে। দু'বছর আগে একবার শুনিছিলাম নলকুঁড়োর করবাবুদের বাড়ী। সাঁইপালার দল। সীতে হরণ পালা করিছিল।

—আমরা কংস বধ পালা করবো। এর মধ্যে বায়না পাইছি ট্যাট্‌রায় মিত্তির বাবুদের বাড়ি। যেও শুনতি।

কে একজন আলো হাতে আসছে ওদিক থেকে। হারানো সাহস ফিরে পায় রূপো। নিশ্চয়ই পাড়ার কেউ!

—এবার তুমি যাও। আমি একা যাতি পারবো।

—তার মানেডা। বলে সুদাম খপ করে রূপোর হাত ধরে। চাপা গলায় বলে—চীৎকার করলি সুবিধে হবে না।

—আঃ ছেড়ে দ্যাও।

—মাইরী আর কি।

রূপো মরীয়া হয়ে চীৎকার করে ওঠে—ছেড়ে দাও, নইলে ভালো হবে না বলতিছি। ছেড়ে দাও—আঃ।

আলো হাতে আসছিল রসিক কাহার। নারী কণ্ঠের চীৎকার শুনে ছুটে আসে। সুদাম ভয় পেয়ে বন-বাদাড় ভেঙে ছুটে পালায়। রসিক হাঁক দেয়—কেডা, পালাও কেডা!

আর পালাও কেডা। যে পালাবার সে এতক্ষণ দু'রাশ পথ পার হয়ে গেছে। রূপো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রসিককে দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।

—রূপো না! কি হয়েছে? কাঁদতিছিস কেন?—রূপো কথার উত্তর দিচ্ছে না দেখে রসিক বিরক্ত হয়ে বলে—শুধু শুধু কাঁদলি হবে? বলবি তো কি হয়েছে।

রূপো কোনো কথা গোপন করে না। যা যা ঘটেছে বলে যায়। রসিক সব শুনেও কোনো কথা বলে না। কেবল ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ করে।

মোহন্ত দাওয়ার কোণে বসে আছে রূপোর প্রতীক্ষায়। সেই দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, সন্ধ্যে হয়ে গেল তবু ফিরছে না কেন? এই ওব ভাবনা। যেখানেই যাক, এতো দেরী তো করে না। উঠোনে দাঁড়িয়ে বার কয়েক উচ্চকণ্ঠে ডেকেছে মোহন্ত—রূপো-ও, রূপো-ও। সাড়া পায় নি। নিশ্চয়ই শুনতে পায়নি! নইলে হয় সাড়া দিত, নয় আসতো।

ওই একটি আলো আসছে। নিশ্চয় কেউ না কেউ পেঁৗছে দিতে আসছে রূপোকে। রাতের বেলা তেমন নজর চলে না মোহন্তর। আলো দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু মানুষ নজরে পড়ছে না।

—কেডা, রূপো নাকি?

উত্তর দিল রসিক—তোমার রূপোরে পেঁৗছে দে গ্যালাম খুড়ো।

—কে রসিক নাকি? এসো। একছিলিম তামাক খেয়ে যাও।

—এখন আর তামাক খাবো না খুড়ো। চললাম! রাগ কোরো না। ফিরে যেতে যেতেই রসিক কথাগুলো বলে।

রূপো তখনো ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এতো সময়, মোহন্তর কানে যায়নি নাতনীর ফোঁপানি। শুনতে পেয়ে বলে—ফোঁপাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে?

রূপো কোনো কথা বলে না। দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁদছে। মোহন্ত এমনিতে ঠাণ্ডা মানুষ। তবে কথার জবাব না দিলে খামোকা রেগে যায়।—কি হয়েছে বলবি তো? না শুধু কাঁদবি।

দাদুর কাছে কোনো কথাই গোপন রাখে না রূপো। দাওয়ায় বসেছিল মোহন্ত। রূপোর কথা শুনে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। গর্জে

ওঠে—শালা, মালো ব্যাটার এতো বড়ো আস্পদ্দা! তোর গায়ে হাত দেছে। আয় দেখি আমার সঙ্গে। ব্যাটার মাথাডা গুঁড়ো করে দে আসি।

—দাদু, মাথা গরম কোরো না। বলে চোখের জল মোছে রূপো। মোহন্ত তবুও রুখে ওঠে—না, মাথা গরম করবে না! দে, আমার তেল-পাকা লাঠিগাছটা দে। বুড়ো হাড়ে ভেল্‌কী দেখিয়ে দেই।

—না। রূপো বলে—তোমারে আমি যাতি দেবো না।

—দুত্তোর ছাই, তোর ওই প্যানপ্যানানি রাখ। মোহন্তর লাঠির ভয়ে চরমুকুন্দপুরে কেউ কখনো টুঁ শব্দ করে নি। আর আজ কিনা—

দাঁত নেই মোহন্তর। মাড়িতে মাড়ি ঘসে বলে—আমার নাতনীর গায়ে হাত দে পার পেয়ে যাবে? তুই দে দিকিনি লাঠি গাছটা—আমি যাই—

তবু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হোলো না মোহন্তর। ঘরের দাওয়ায় বসে আপন মনে গর্জাতে থাকে। বুড়ো বাঘ ক্ষেপেছে। রূপোর মনে ভয় জাগে। দাদুকে ও দেখেছে ছোটবেলা থেকে। এমনিতে ঠাণ্ডা মানুষ। কিন্তু রাগলে জ্ঞান থাকে না। লোক-মুখেও দাদুর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে। দাদু নাকি এক সময় দুর্দান্ত লোক ছিল। অন্যায় সহ্য করেনি কখনো। যখন তখন বিপদ আপদ জ্ঞান না করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। তখনকার দিনে নাকি দাদুর মতো সাহসী লোক এ তল্লাটে ছিল না। দেহে ছিল অসুরের শক্তি। এ অঞ্চলের সবাই বলে, দাদু নাকি একবার লাঠি দিয়ে একটা কেঁদো বাঘ মেরেছিল। সেই থেকে লোকে বলতো—কেঁদো-মারা মোহন্ত।

এই কেঁদো-মারা মোহন্তকে নিয়ে অনেক গল্প-কথা এ তল্লাটে শোনা যায়। রূপোও শুনেছে।

রসিক কাহার যে সামান্য ঘটনা এমন অসামান্য করে তুলবে এ ধারণা রূপো বা মোহন্ত কেউ করেনি। সাত সকালে কাহার পাড়ার মাতব্বররা এসে ভিড় করলো মোহন্তর-বাড়ী। রসিকও এসেছে ওই সঙ্গে। উঠোনে সজনে গাছের ছায়ায় বসেছে সবাই। মোহন্ত বসেছে মাঝখানে জলচৌকির ওপর।

প্রথমটা সবাই চুপ। এরা কেন এসেছে, কি বৃত্তান্ত সব কিছু বিবৃত করেছে ভণ্ড কাহার। মোহন্ত বিস্মিত হয়। এরা দল বেঁধে এসেছে রূপোর কেচ্ছা গাইতে। শুনে গর্জে ওঠে মোহন্ত—তোমরা এয়েচো আমার নাতনীর কেচ্ছা গাইতে। ছিঃ ছিঃ, এসব কথা কেডা বললে তোমাদের? আমার নাতনীর গায়ে হাত দেছে ওই মালো ছোঁড়া. তোমরা তার বিচার না করে, এয়েচো আমার নাতনীর বিচার করতি! বলিহারি দেই!

ফণী কাহার পাড়ার মধ্যে মুরুব্বী গোছের। শহরের ফৌজদারী আদালতে দা[illegible]লি করে বুদ্ধিটা পাকিয়েছে। উকীল মোক্তার বাবুদের পিছু ঘুরে ঘুরে আইনের মার পঁ্যাচ ও বুঝতে শিখেছে। প্রথমটা চুপচাপ বসে এর ওর কথা শুনছিল ফণী। এবারে নিজে বলতে আরম্ভ করে। বলে—আমাদের ওপর রাগ দেখিয়ে কি করবা খুড়ো? রসিকদা যা নিজের চোখে দেখেছে তা তো অবিশ্বেস করা যায় না।

—কি দেখেছে রসিক! ফণীর কথার মধ্যে মোহন্ত ফুঁসিয়ে ওঠে। ফণী বারকতক গলা ঝাড়া দিয়ে বলে—তোমার আদুরে নাতনী সুদামের গলা জড়িয়ে আসতিছিল!

—মিথ্যে কথা। মোহন্ত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে রাগে।

—সত্যি মিথ্যের হিসেব পরে হবে। এখন রসিকদা যা নিজের খোলা চোখে দেখেছে তা'তো উড়িয়ে দিতে পারো না। রূপো সোমত্ত মেয়ে, উনিশ কুড়ি বছর বয়স হয়েছে—আমাদের সমাজে অতো বয়স অব্দি মেয়ে আইবুড়ো রাখে না কেউ—রেখে তো দেখতেছো—শেষডা ও মেয়ের বে হওয়াই দায় হবে।

—না হয় না হবে ওর বে! মোহন্ত দারুণ উত্তেজনায় ফেটে পড়ে—তোমরা না পারো, ওই মালো ছোঁড়ারে আমি একাই শায়েস্তা করবো। কিন্তু রসিক, তুমি এমন মিছে কথা বলতি পারলে?

—চোখে যা দেখিচি তাই বলিচি।

—কিন্তু কাল রাত্তিরে তোমার বলতি কি হইছিল? রূপোরে যখন পোঁছে দে গেলে—

রসিক চুপ করে থাকে। মোহন্তর মুখের দিকে ফিরেও চায় না। ফণীর লম্বা চেহারার আড়ালে ও বসে আছে মাথা নীচু করে। রসিকের প্রকৃতি কোনদিন সরল নয়। কারণে অকারণে লোকের পেছনে লাগা ওর চিরকেলে স্বভাব। সন্ধ্যার পর ও রূপোকে বাড়ী পৌছে দিয়ে এপাড়া-ওপাড়া করে বেড়িয়েছে। ভালোমন্দ চিন্তা করে নি, শুধু ভেবেছে কি করে সমাজের কাছে মোহন্তর পাকা মাথাটা হেঁট হয়ে যায়। অথচ মোহন্তর সঙ্গে ওদের বংশের কারো কোন শত্রুতা ছিল না, আজো নেই। কিন্তু সুজয় যে রূপোর সঙ্গে মেলামেশা করে সেটাও চায় না রসিক। রাজুবালা টগর যাই বলুক, রসিক চায় অন্যত্র ছেলের বিয়ে দিতে। এখানে ওখানে মেয়েও দেখেছে বার কয়েক! সুজয় বাগড়া দিয়েছে। নয় তো এতোদিনে ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ আনতো রসিক।

ফণী বলে—অতো কথায় কাজ কি? যা হবার হয়েছে! সুপাত্তর দেখে নাতনীর বে দ্যাও।

মোহন্ত গুম হয়ে বসে থাকে, কটমটিয়ে তাকায় এর ওর মুখের দিকে!

চন্দর কাহার গরীব মানুষ। মজুরি খেটে খায়! দু'বেলা খাওয়াও জোটে না সব সময়, ছেঁড়া তেনকা পরে দাঁড়িয়ে আছে এক দিকে! ও মানুষটা কাঠখোট্টা স্বভাবের। মিষ্টি কথাও কর্কশ শোনায় ওর মুখে, এতো সময় টুঁ শব্দ করেনি, এতোক্ষণে মুখ খোলে,—আরে মেয়ের বে দেওয়া না দেওয়া বাপঠাকুর্দার

ইচ্ছের ব্যাপার ! সে কথা এখানে কেন ? যে অন্যায় কাজ সুদাম মালো করলে, তার বিচারডা আগে হবে, তা না—যতো সব ভণ্ডুলে ব্যাপার !

—তুই ছোটো মুখে বড়ো কথা কোসনে। ফণী, রুখে ওঠে, সব এক ঠাঁই বসে মিটিন করছে, সেখেনে তুই কথা কস কেন ?

—ওঃ, ভারী আমার সমাজ, তার আবার মাথা। গলার সুর সপ্তমে চড়িয়ে চন্দর বলে—আগে সুদামের বিচার করো। তারপর সুপাত্তর এনে রূপোর বে দিও।

—হেঃ, ওই মেয়ের জন্যি সুপাত্তর বেন্দাবনে বসে আছে। জীবন কাহার ব্যঙ্গোক্তি করে—ও মেয়ের ভেতর ভেতর অনেক গুণ। চরমুকুন্দপুরের উব্যশী।

মোহন্ত আর সহ্য করতে পারে না কথার খোঁচা। যারপরনাই উত্তেজিত হয়ে বলে—থাক্, তোমাদের আর কথা বলতি হবে না। তোমাদের কোন কথা আমি শোনব না। সিধে পথ আছে, চলে যাও।

প্রথমে ফণী তারপর একে একে আর সবাই মোহন্ত আর রূপোকে ধিক্কার হানতে হানতে চলে যায়। শুধু যায় না চন্দর। সে দাঁড়িয়ে থাকে মোহন্তর সঙ্গে দু'একটা কথা বলবে বলে।

ঘরে দরজার আড়ালে দাড়িয়ে সবই শুনেছে রূপো। সবাই চলে যেতে তবে বাইরে আসে। চন্দরকে ডেকে বলে—তুমি পষ্ট কথা না বললেই পারতে !

—কেন, কেডা কি করবে আমার ? কারো ঘরের চালে চাল দে আমি বাস করি নে। দেখলি নে, ওরা দল বেঁধে এয়েছে তোকে উদ্ধার করতি। কি আর বলব। ওই রসিক হ'ল মিটমিটে ঘাগী। ওই তো রাত্তিরে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ঘোঁট পাকিয়েছে। ও নাকি দেখেছে, তুই সুদামের সঙ্গে রাস্তায় ঢলাঢলি করতিছিলি।

—এই কথা বলেছে রসিক মোসা !

—বলেছে, আমার সঙ্গে বলেছে। ওরে দেখে তুই নাকি কেঁদেছিলি।

মোহন্ত বলে—ওরা ভেবেছে, বুড়ো হয়ে মোহন্ত ঢোঁড়া সাপ বনে গেছে। তাই এত বুকের পাটা হতভাগাদের। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি বাছাধনদের।

—দাদু তুমি চুপ কর দিকিনি। রূপো দাদুকে এই বলে বোঝায়, ওরা যা বলেছে বলুক। তাতে ওর গায়ে ফোস্কা পড়বে না।

একদিন কাজ কামাই করলে চন্দরের সংসার অচল। দিন আনা দিন খাওয়া। তাই আর কথা না বাড়িয়ে 'সন্ধ্যের পর আসব' বলে চলে যায়। বসে থাকলে রূপোরও চলবে না। চ্যাড়শ ক্ষেতে এখনো ঘাস হয়ে আছে। সেও দাদুকে পান্তা খাইয়ে নিজে খেয়ে নিড়েন নিয়ে বাগানে ঢোকে। যদিও অন্যদিনের মতো কাজে মন দিতে পারছে না সে!

মোহন্ত দাওয়ার ওপর তালপাতার চাটাই বিছিয়ে বসে তামাক টানছে। আর চেয়ে দেখছে উঠোনের তাল গাছটার দিকে। সেই তালের চারাটা আজ আকাশ স্পর্শ করেছে। রায়হাটের দত্তবাবুদের সদর নায়েবের বাড়ীর তালের চারা ওটি। ভারী মিষ্টি জাতের তাল। সে স্বাদ এখন মুখে জড়িয়ে আছে। নায়েব গিন্নী দু'টি তাল দিয়েছিল মোহন্তকে। বলেছিল বড়া করে খেতে। বড়া করেনি, নারকেল কোরা দিয়ে তাল-ক্ষীর বানিয়েছিল মা। সেই তালের একটি আটি সযত্নে পুঁতেছিল উঠোনের মাঝখানে। তখন মোহন্তর বয়স কত। বছর বার তের। মোহন্তর বাবা তখন বেঁচে। বাবা ছিল দত্তবাবুদের বেহারা। আর মোহন্তর কাজ ছিল বাবুদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে রাখা। বাবা মারা গেলে মোহন্ত হলো

পালকি বাহক। ক্রমে খাস বেহারা। তিন তিনটে পালকি ছিল দত্তবাবুদের। নক্সা করা পালকি। মেয়েরা বাড়ীর বাইরে যাবে—পালকি চাই। ছোট ছেলে-মেয়েরা বেড়াতে যাবে নদীর ধারে—পালকি চাই; কর্তা বাবুরা গঞ্জে কি শহরে যাবেন—পালকি চেপে। শুধু ছোট কর্তা ঘোড়ায় চড়তেন। পালকি বয়ে মোহন্তর দু'টি কাঁধে কড়া পড়ে গিয়েছিল। যদিও শেষটা আর মোহন্তকে পালকিতে কাঁধ দিতে হত না। তখন ওর কাজ ছিল—বেহারা, চাকর দারোয়ানদের খবরদারী করা। আরও কাজ ছিল মোহন্তর। বাবুরা সদরে যাবেন, কি মফঃস্বলে যাবেন, মোহন্ত না গেলে চলবে না। নইলে চোখে অন্ধকার দেখবেন বাবুরা। কোন চাকর দারোয়ান যখন তখন অন্দরে ঢুকতে পারত না। কিন্তু—মোহন্তের জন্যে দরজা সব সময় খোলা। কত সময়ে অন্দরে বৌ-ঝিদের সঙ্গে হাসি তামাসা করেছে ও।

এ ছাড়া আরও অনেক কাজ করতে হত মোহন্তকে। লাঠিবাজি করবে দত্তবাবুদের পাইক, বরকন্দাজ—সেখানেও লাঠি ধরতে হবে মোহন্তকে। মোহন্তর গায়ে ছিল দুর্দম শক্তি, মনে ছিল অমিত সাহস। বিপদকে পরোয়া করতো না। এক-আধদিন নয়, দীর্ঘ তিন কুড়ি বছর মোহন্তর কেটেছে দত্তবাবুদের বাড়ীতে। দশ বছর বয়সে বাপের সঙ্গে যায়, আর সত্তর বছরে বাড়ীতে এসে স্থির হয়ে বসে। যদি না পড়তো দত্তবাবুদের অবস্থা, তাহলে আজো সে থাকত বাবুদের বাড়িতে। প্রায় দু'কুড়ি বছর হলো, মোহন্ত বাড়ীতে বসে আছে। ও চোখের সামনে দেখছে দত্ত বংশের বিপর্যয়। জমিদারী গেল, গেল ধন-সম্পত্তি, মান-মর্যাদা। লক্ষ্মী ঠাকরুণ বড় চঞ্চলা। দত্তবাড়ীর লক্ষ্মী গেল সংগ্রামপুরে বোসেদের বাড়ী। মোহন্তকেও তারা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু মোহন্ত যায় নি। মোহন্ত সব কাজ করতে পেরেছে বাবুদের হুকুম মত, কিন্তু পারে নি লক্ষ্মী বেঁধে রাখতে। পাপ ঢুকলে কি কিছু থাকে? কুলের বৌ কুলত্যাগ করলেন, বাবুরা মাতলেন আমোদ-প্রমোদে। জলের মত টাকা

খরচ হতে লাগল। শুধু টাকা। রাশি রাশি টাকা। সোনা-দানা মোহর। একজন বাইজী আসত। কি যেন নাম তার। ইমলী বেগম। বেগম নাচত পূজোর দালানে। মদ আর মেয়েমানুষ। এই তু'য়ের নেশাতে বাবুরা পথে বসলেন। কেবল ছোট তরফের কিছু ছিল। তাই নিয়ে তিনি উঠলেন ডাঙ্গায়। ডুবতে ডুবতে ডুবলেন্ না। দেখে শুনে দেশের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন কলকাতায়। সেই যে দেশ ছাড়লেন আর একটিবারও আসেন নি। ছোট কর্তা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন মোহন্তকে। মোহন্ত যায় নি। কেমন করে যাবে বড়বাবুকে ফেলে। বড়বাবুকে দেখে মনে হত, যেন বাজে পুড়ে যাওয়া একটি গাছ।

মোহন্তর মাথাটা ঘুরে যায় আচমকা। ভাবতে পারে না পুরোনো দিনের কথা। জীবন যদি শেষ হয়ে যেত, ভাল হত। যম যে দেখতে পায় না। ওই উঠোনের তাল গাছটার মতো অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে জন্মেছে মোহন্ত। মৃত্যু নেই।

রূপো আজকাল বাড়ীর বাইরে যায় না বললেই হয়। কোথায় যাবে? এক যেত টগরের বাড়ী। সে পথেও কাঁটা। টগরও আসে না। অথচ আগে এমন দিন ছিল না, যেদিন দেখা হত না টগরের সঙ্গে।

দিন রাত কাজ নিয়েই আছে রূপো। ক্ষেত-খামার আর গাই-গরু তু'টির খেদমত খেটেই সকাল বিকেল কাটায়। এ ছাড়া রান্না-খাওয়া, ঘরের টুকটাক কাজ তো আছেই; শুধু খাবার জল আনতে মনসাতলার টিউবওয়েলে একবার যেতে হয়। আগে স্নান করতে যেতো ও পাড়ার সানবাঁধানো পুকুরে। এখন নিজেদের খিড়কীর ছোট পুকুরেই স্নান করে, গা ধোয়।

পাড়ার লোকজন বড় কেউ আসে না ওদের বাড়ীতে। আসে কেবল চন্দর আর নিতাই। রূপো ভাবে, টগর আসে না কেন।

এতো ভাব ছিল, তা কি উবে গেল কর্পূরের মতো ? ভাব ভালবাসা তো উবে যাবার জিনিস নয়।

হাটবার। দুপুর গড়িয়ে গেছে। খানিকবাদেই নিতাই আসবে। সওদা নিয়ে যাবে হাটে। ঢ্যাড়োশ, কাঁচা লঙ্কা তোলা হয়ে গেছে। এখন মাচা থেকে চাল কুমড়োগুলো ছিঁড়তে পারলেই হলো। এক কাঁদি কাঁচাকলা বাতি হয়েছে। থাক আর দুদিন। আসছে হাটে পাঠালেই হবে।

—বাব্বাঃ, এখনো তোমার হয় নি ? নিতাই এসেছে। চাল-কুমড়ো পাড়ছে রূপো। বলে—এসো নিতাই দা। তোমার শরীর কেমন ?

—ভালো তো ছিলাম। সকালে গোয়াতুর্মি করে কাঠচেলা করতি গে গা- ত: বেথা করে ফেলিচি। দ্যাও, হাত চালাও। বেলা পড়ে গেল যে।

—তুমি ওই ছাঁচতলা থেকে ঝুড়িটা নে এসো। আমার হয়ে গেছে। এই কুমড়োটা পেড়ে নেই।

নিতাই নিজের হাতে ঝুড়িতে তরিতরকারীগুলো সাজিয়ে নেয়। আজ মাল হয়েছে বেশী। তা হোক্।

নিতাই জিজ্ঞাসা করে—কিছু আনতি টানতি হবে নাকি ?

—হবে বৈ কি ! দু'আনার জিরে মরিচ, পেঁয়াজ আধসেরটাক। আর যদি ভালো নোনাগুলে পাও চার ছ'আনার এনো। দাদু রোজ নোনাগুলে খা'বা খাবো বলতেছে। বলে মনে মনে হিসেব করে দেখে রূপো, আর কিছু আনতে হবে কিনা—হাঁ, দু'আনার পান তামাক এনো।

—নে°, ঝুড়িটে ধরে দ্যাও।

গামছার আলটার ওপর নিতাই ঝুড়িটা জুৎ করে বসিয়ে নেয়। বসিরহাটের হাট এখান থেকে পাকা সাড়ে তিন মাইল পথ। যেতে একঘণ্টা লেগে যায়। ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে

নিতাই বলে—ছাখো, আর কিছু আনতি হবে কি না। আজ রোববার, হাট আবার সেই বিযুদ্‌বারে।

রূপোর মনে পড়ে সুজয়ের কথা। হাটখোলায় দোকান তার। হাটে গেলে নিতাইদা সেখানে যায়। হয়তো আজো যাবে। ইতস্তত করে বলে—সুজয়ের সঙ্গে দেখা হবে?

—হতি পারে। কেন?

—না, কিছু না। এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

সুদাম-রূপোর কথা নিয়ে শুধু কাহার পাড়ার লোক জোট পাকায়নি—মালোপাড়া, বাগ্‌দীপাড়াতেও রীতিমতো আলোচনা চলছে। নানানভাবে পল্লবিত হয়ে এমন সব কথা রটনা হচ্ছে, যাতে সত্যি চাপা পড়ে মিথ্যেটাই বড়ো হয়ে উঠেছে। পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, খড় নেই ঘরের চালে, তবু কেচ্ছা গাইতে কসুর নেই কারো। এই কেচ্ছা কাহিনী পৌঁছেচে গ্রামান্তরের কাহার সমাজে। সেখানেও এ নিয়ে গুঞ্জন। চরদিয়ার দুর্যোধন কাহার বলেছে নলকুঁড়োর নরু ঠাকুরকে—মোহন্তরে নাকি তারা একঘরে করবে। নরু ঠাকুরের ছেলে বলাই সে কথা চুপিসারে বলে গেছে রূপোকে। রূপো শুনে হেসেছে। বলেছে—ভারী তো সমাজ তার আবার কুলোপানা চকোর। করে করুক একঘরে। না হয় কারো ঘরে যাবো না। কি বল ঠাকুর?

বলাই উত্তরে বলেছে—যদি এ রকম মাথা উঁচু করে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারো, তবে বলব হাঁ। পারবে তো?

—আশীব্যাদ করো ঠাকুর, এ মাথা যেন হেঁট না হয়। ঠিক পারবো। ঘুন ধরলি পাকা বাঁশ ভেঙে যায়। আর এ তো হা-ভাতেদের সমাজ। কেডা শুনতেছে সমাজের অন্যায় কথা? চোখে তো সব দেখতি পাচ্ছি। কেডা কতো সাধু, জানতি বাকী নেই।

—বাঃ তুমি তো বেশ কথা বলতে পারো। শিখলে কোত্থেকে?

—কোত্থেকে আবার? আমি তো লেখাপড়া জানিনে। কেবল

সুজয়ের কাছে বাংলা পড়াডা একটু আধটু শিখিছিলাম। নামডা লিখতি পারি। তারে তো কিছু শেখা বলে না। তবে চোখে দেখে কানে শুনেও তো অনেক কিছু শেখা যায় ঠাকুর।

রূপোর কথা শুনে খুশী মনে চলে গিয়েছিল বলাই। বলে গিয়েছিল আবার আসবে। কিন্তু দশ বারো দিন হয়ে গেছে, আসেনি বলাই ঠাকুর।

বলাইকে ভারী ভালো লাগে রূপোর। এই রকম মানুষেরাই তো দেবতা। হাসি ছাড়া কথা নেই মুখে। রাগ নেই, হিংসা নেই। দো আঁশ মাটির মতো সহজ। কতো গুণ বলাই-এর। লেখাপড়া জানে, মাটি দিয়ে নিখুঁত পুতুল গড়তে পারে, আবার গান গাইতেও জানে। পুতুল গড়া, গান গাওয়া এসব ও কারো কাছে শেখেনি। নিজের মনের থেকে হয়েছে। রূপো দেখেছে বলাই ঠাকুরের গড়া সুন্দর পুতুল। শুনেছে গাওয়া গান। অনেকদিন আগে, রূপো তখন খুব ছোট।

চরদিয়ার দুর্যোধন কাহার আজ আসবে বলেছে মোহন্তর বাড়ী। লোক দিয়ে খবর দিয়েছে গতকাল। মোহন্ত ভালো-মন্দ কিছু বলেনি। আসে আসবে, না আসে না আসবে। তার আসা না আসায় মোহন্তর কিছু যায় আসে না।

দুর্যোধন এলো সন্ধ্যের আগে। সঙ্গে চরদিয়ার বৈকুণ্ঠ আর এই গ্রামের ফণী ও জীবন। তালপাতার চাটাই বিছিয়ে বসতে দিয়েছে রূপো। জিজ্ঞাসা করেছে—আমি জল পান দিলে আপনারা খাবেন তো?

ফণী আইন বোঝে। বে-আইনী কাজ সে করবে না। বলে—তেষ্টা আমার পায় নি রূপো, আর দাঁতের বারামে পান খাওয়া ছেড়ে দিইছি।

দুর্যোধন এক নজরে চেয়ে দেখে রূপোকে। বলে—শুধু জল পান দিলে হবে না, ভালো করে তামাক খাওয়াও।

জল পান খেয়ে তামাক টানছে দুর্যোধন। এবারে কথাবার্তা শুরু হবে। জলচৌকির ওপরে বসে হাঁটু নাচাচ্ছে মোহন্ত। আর এক একবার ফিরে তাকাচ্ছে জীবনের দিকে। সম্পর্কে মোহন্তর নাতি হয় জীবন। মুখ ফিরিয়ে বসে আছে জীবন। দেখছে উঠোনের তালগাছটা। পেছনে যে যাই বলুক, মোহন্তর মুখোমুখি বসে কথা বলা খুব সহজ নয়। রাশভারী লোক মোহন্ত। তার ওপর বয়সের ভার আছে। দুর্যোধন, জীবন, ফণী, বৈকুণ্ঠ এরা তো মোহন্তর কাছে নাবালক। কেউ কিছু বলছে না দেখে মোহন্তই প্রথমে কথা পাড়ে।

—কি সোমাচার সব? হঠাৎ দল বেঁধে আমার কাছে?

ফণী বলে—কেন, তোমারে তো খবর দেওয়া হইছিল খুড়ো।

—কেন আসবা, কি বিত্তান্ত তাতো কিছু বলে নি। শুধু কালো-পানা একডা ছ্যাঁমড়া এসে বলে গেল, দুর্যোধন আসবে। বললাম, কোন দুর্যোধন? না চরদিয়ার। তা আসবে, আসবে। দুর্যোধনের বাপ্‌রে আমি হতি দেখিচি। ওর ঠাকুর্দারে আমি হাত ধরে নে গিছিলাম দত্তবাবুদের বাড়ী। তবে তো ওর ঠাকুর্দা কাজ পায়। আমার কাছে কম বকুনি খেয়েছে ওর ঠাকুর্দা! কাজের নামে খোঁজ নেই. বসে বসে গাঁজা খাবে। গাঁজা খেয়ে খেয়ে হতভাগার বুকের খাঁচা গেল শুকিয়ে। শেষটা মরেই গেল। তখন ওর বাপের বয়েস আট কি দশ। কি আর করি! ওর বাপ্‌রে নে এ্যালাম আমার বাড়ীতে। পেট-ভাতায় থাকতো। গরু বাছুর দেখতো। ওর ঠাকুমা ধান ভানতো এ-বাড়ী সে-বাড়ী। তারপর ডাগর হলি ওর বাপের বে দেলাম দাঁড়িরহাটের কালো সতীশের খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে। তার ছাবাল দুর্যোধন নাকি চরদিয়ার মোড়ল হয়েছে। বুঝোন মোড়ল! ফুঃ।

দুর্যোধনের মুখ চোখ্ লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিবাদের উপায় নেই। একটি কথাও মিথ্যে বলেনি মোহন্ত। এমন হবে জানলে ও কিছুতেই আসতো না।

মোহন্ত জিজ্ঞাসা করে—মিছে কথা বলিচি দুর্যোধন? শুনিচি তোর মা নাকি অন্ধ হয়ে গেছে। তা, চোখে কি মোটে দেখতি পায় না?

—না। দুর্যোধনের গলা শুকিয়ে উঠেছে। আড় চোখে তাকায় ফণীর দিকে। ফণী বলে—এখন কাজের কথা হোক্।

—তা তোমাদের কাজের কথা থাকে, বলা কওয়া করতি পারো। আমি ঘরে গ্যালাম।

—তুমি গেলে চলবে কেন?

—তোমাদের কথায় আমি থেকে কি করবো?

—তোমারে বাদ দে তো আমরা কথা বলতি পারি নে।

তা বেশ, বলো, কি বলবা।

যত্তোই মুখ-ফোঁড় হোক ফণী, তবু আসল কথা পাড়তে বারবার ঢোক গিলতে থাকে। যদিও শেষ পর্যন্ত বলে—রূপো আর সুদাম মালে র নে যে সব কথা উঠেছে—

—থুঃ থুঃ। মোহন্ত গলা ঝেড়ে থুথু ফেললো উঠোনে। বলে—ওঠে উঠুক। রূপো তো তোদের কেউ না। তার গায় যদি কুষ্ঠ হয়, তা হলি তোদের কি? যা, যা— রাস্তার গে ফ্যাচোর ফ্যাচোর করগে যা। ঘুঁটে কুড়ুনির ছেলে আবার আমারে বোঝাতে এয়েচে। এই জীব্‌নে তুই এইচিস কি করতি? তোর বাপ তো মোছলমানের এঁটোপাতার ভাত খেয়ে মানুষ হয়েচে। তোরও কি পাখনা গজিয়েচে নাকি? বাবা, কালে কালে দ্যাখপো কতো! যতো সব নল বুনে, সব হোলো কেত্যনে। ফুঃ।

ফণী তবুও বলে- কথাগুলো শুনলি ভালো হোতো ঠাকুরদা।

—থুতু ফেলি দেই তোদের কথায়। গলা টিপলে দুধ বেরোয়, তারা আবার হিত্ কথা শোনাতে এয়েচে আমারে। যা বাড়ী যা। তোদের কথা আমি শোনবো না। যা, বাড়ী গে নিজের নিজের ঘায়ে মলম লাগা গে।

একে একে সবাই চলে গেল থোঁতামুখ ভোঁতা করে। মোহন্তর

দাঁত নেই। জোরে হাসলে বেসুরো শোনায়। তবু হাসলো উচ্চকণ্ঠে। রূপো খুশী মনে বাইবে এসে দাদুর গলা জড়িয়ে বলে—আরো দশকথা শোনালে না কেন?

—যা বলিচি, তাই হতভাগারা হজম করুক গে। বলে মোহন্ত আদরের নাতনীর চিবুক স্পর্শ করে।

নদীর তীর ঘেঁসে মালোদেব বসতি। বেশী নয় মাত্র পনের বিশ ঘর। ছোট পাড়া। নাবাল জমিতে এদের বাস। জোয়ারের জল মাঝে মাঝে উঠোনেও ওঠে। স্যাঁতসেঁতে মাটির ঘব। নোনা ধরে খসছে, গলছে। মাছ মারা পেশা। নদী-নালা, খাল বিলে মাছ ধরে কাটে এদের দিন। সে যাই হোক্, স্বভাবে এরা উগ্র। কারণে অকারণে মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামা করে। কিছুদিন আগে বাগ্দীদের সঙ্গে এমন দাঙ্গা হোলো, যে দু'পক্ষেব কিছু লোক জখম হয়ে হাসপাতালে গেল। এখনো মালোপাড়ার চারজন হাজতে পচ্ছে।

মালোরা আসায় বাগ্দীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শান্তিপ্রিয় বাগ্দীরা কোনোকালে ঝগড়া ঝাঁটি বুঝতো না। আগে রাতের বেলা নদীতে বেন জাল ফেলে নিশ্চিন্ত মনে বাগ্দীবা ঘুমোতো নৌকোর ছই-এর নীচে। খালে বিলে দোড় পেতে নিশ্চিন্তে ঘরে শুয়ে বাত কাটাতো। আজকাল দল বেঁধে পাহারা দিতে হয়। নচেৎ মালোরা সব তছ্নছ্ করে দেবে। একই পেশা, জীবনেব মানদণ্ড এক, অথচ দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে এতটুকু সদ্ভাব নেই।

মালোপাড়ার মোড়ল চৈতন্য মালো যাবপরনেই গোঁয়ার গোবিন্দ। হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত নেই। পাড়ার মধ্যে ওরই অবস্থা স্বচ্ছল। বাপ-পোয় মিলে পাঁচজন কর্মঠ। নৌকো আছে তিনটে। ঝড়াজাল বেনজাল সবই আছে। মাছ ধরা ছাড়া—নৌকো, জাল

ভাড়া দিয়েও রোজগার হয়। চৈতন্যর সেজো ছেলে সুদাম। যে সুদামকে নিয়ে কাহারপাড়ায় গণ্ডগোল। সুদাম জানে কাহাররা ওদের কাছে কেঁচো। কাহার সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙা। তাই ওরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি দলাদলি করে মরে। কিন্তু মালোরা এক। ওদের ঝগড়া আছে ঘরে ঘরে, কিন্তু ঘরের বাইরে ওরা এক—অভিন্ন।

রূপোর ব্যাপার নিয়ে মালোপাড়াতেও ক'দিন মজলিশ বসেছে চৈতন্যর বাড়ীতে। সুদাম সেখানে জোরের সঙ্গে বলে দিয়েছে, রূপোরে সে বিয়ে করবে। তা যেমন করে হোক। বলেছে ও ছুঁড়ির ডাঁট আমি ভাঙবো।

চৈতন্য বলেছে—সে যা হয় হবে। কিন্তু কাহারদের চাট সহ্য করবো না। পালকি-বওয়া জাত—তাব আবার তড়পানি!

মালোদের ওই এক কথা। কাহাররা যে ওদের ওপর টেক্কা দেবে, সেটি হবে না। বাগ্দীরা কিন্তু এসব গণ্ডগোলের বাইরে। ওরা ঘরেও যেমন বাইরেও তেমন। নিজেদের দুঃখের ধান্দায় নিজেরা ঘোরে। মালোরা মাছ ধরা নিয়ে যে রকম আরম্ভ করেছে, তাতে শান্তিতে কাটানো দায়। রতন বাগ্দী পাড়ার মধ্যে মাতব্বর। বলেছে—গণ্ডগোল করতি পারবো না। নয়, এখেনকার বাস তুলে উঠে যাবো। অভাব এখেনেও আছে, যেখেনে যাবো সঙ্গে যাবে। তাই বলে মাছ মাছ করে অশান্তি করতি পারবো না। কিন্তু আজকালকার ছেলেরা অতো নরম স্বভাবের নয়। তারা বলে, মার খেয়ে পালাবো, তা হবে না।

অনেকদিন পর আজ পাড়ায় বেরিয়েছে মোহন্ত। গেছে চন্দরের বাড়ী। অনেক করে বলে গেছে চন্দরের মা। ওদের বাড়ী সত্যনারায়ণের পূজা। না গেলে ভদ্রতা থাকে না। তাছাড়া নারায়ণের পাঁচালী শোনা এবং প্রসাদ পাওয়ার নেশা আছে বৈকি। পাঁচালীতে কতো কি লেখা আছে। সত্যনারায়ণের

পূজো করলে ভিখারী পায় কুবেরের ঐশ্বর্য। আবার ঠাকুরের প্রসাদ মাটিতে ফেললে কুবেরের ঐশ্বর্যও হারিয়ে যায়। আশ্চর্য! মোহন্ত কতোদিন ভেবেছে এখনো তো সত্যনারায়ণ পূজো হয়, কই, ধন-ঐশ্বর্য তো হয় না। তবে কি সত্যনারায়ণ মিথ্যে হয়ে গেছে? না—সত্যনারায়ণ সত্যি আছে। নেই শুধু ভক্তি। তাই মানুষের এতো দুর্গতি।

নরুঠাকুর নয়, আজ পূজোয় বসেছে নরুপুরুতের ছেলে বলাই। পূজো প্রায় শেষ হয়ে এলো। মোহন্ত বসেছে ঘরের এককোণে। শুনেছে ঠাকুরের মন্ত্রপাঠ। শুনেছে সত্যনারায়ণের পাঁচালী। তারপর ভক্তিভরে প্রণাম করেছে অদেখা দেবতাকে।

এবার প্রসাদ বিতরণের পালা। বাইরের দাওয়ায় বসেছে পাড়ার পুরুষেরা। মোহন্তকেও হাত ধরে এনে বসালো চন্দর। যেন মৌচাকে ঢিল পড়েছে। গুঞ্জন ওঠে নানা কণ্ঠে। মোহন্তর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে কেউ প্রসাদ গ্রহণ করবে না। প্রথমে চন্দর হাতজোড় করে অনুরোধ করে। তারপর আসে চন্দরের বুড়ি মা। তাতেও কোনো ফল হলো না দেখে বলাই ঠাকুর বাইরে আসে। বুঝিয়ে বলে—এতো সামাজিক ক্রিয়া নয়, যে এক পংক্তিতে বসে খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে। এতো দেবতার প্রসাদ নেওয়া মাত্র। দেবতা তো সমাজপতিদের একার ন'ন।

ফণী বলে—তুমি কালকের ছেলে। তোমার বাবা হলি একথা বলতেন না।

বলাই শান্তস্বরে বলে—বাবাও এই কথা বলতেন। ঠিক আছে, বাবা যখন আসেননি তখন আমিই বলছি। মোহন্ত ঠাকুর্দা তোমাদের সঙ্গে এক সারিতে বসবে।

চন্দরকে লক্ষ্য করে রসিক বলে—তোমার কি এই কথা চন্দর?

—তা ঠাকুরমশায় যখন বলতেছেন—

—বেশ আমরা চললাম। বলে ফণীই প্রথম আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। তারপরে একে একে অনেকে। বয়স্কদের

মধ্যে গেল না শুধু নিতাই, বিনয় আর তিনু। তাছাড়া কাচ্চা বাচ্চা জনকয়েক রইলো। মেয়েদের মধ্যেও অধিকাংশ চলে গেল। উপায় কি ? ঘরের পুরুষরা গেলে কি ওরা থাকতে পারে !

মোহন্ত বলে—চন্দর, তোরেও এরা একঘরে করবে।

—করুক গে। চন্দর বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, এ জাতের উন্নতি হবে না। বুঝলে ঠাকুর্দা, নিজেরা কি করে বাঁচবে তার ঠিক নেই, শুধু সমাজ সমাজ করবে। বলি, সমাজের আছেডা কি ?

যারা ছিল, তারা একে একে প্রসাদ গ্রহণ করে বাড়ী যায়। মোহন্তও যাবে। ঘরে একা রয়েছে রূপো। অন্য সময় হলে চিন্তা হতো না মোহন্তর। এখন কিছু বলা যায় না। বিশেষ করে ওই সুদাম ছোঁড়াটা সব পারে।

—একা যাতি পারবা তো ঠাকুর্দা ?

—তা খুব পারবো। লাঠি আছে, ঠিক যাবানে ঠুক ঠুক করে। আজকাল চোখে ভালো ঠাহর পাইনে, তাই ভাবনা হয়।

—আমি তো ওই পথ দিয়ে যাবো। বলাই ঠাকুর বলে, দাঁড়াও, এক সঙ্গে যাবো মোহন্ত ঠাকুর্দা।

মোহন্ত নাছোড়বান্দা। বলাইকে না বসিয়ে ছাড়বে না। উঠোন থেকেই ডাক দেয়—অ রূপো, রূপো। কম্বলের আসনটা চৌকির ওপর পেতে দে। ঠাকুরপুত্তুর এয়েচে। বলে মোহন্ত জিজ্ঞাসা করে বলাইকে, আজ তুমি এলে কেন পূজো করতি ?

—বাবা গেছেন ট্যাট্রায়। দীনু মোড়লের ছেলের পাকা দেখা।

—কোন দীনু, মাক্যণ্ডের ছেলে ?

—হাঁ।

—সেও আবার মোড়ল হয়েছে নাকি ? মোহন্ত অবজ্ঞা ভরে বলে, আজকাল দেখতিচি সবারই ল্যাজ গজাচ্ছে।

দাওয়ার ওপর কাঠের জলচৌকি। আসন বিছিয়ে দিয়েছে

রূপো। বসেছে বলাই ঠাকুর। মোহন্ত বসেছে গল্পের ঝুলি খুলে। পুরোনো দিনের গল্প। মোহন্তর কাছে যা চিরনতুন। অতীতের কথা বলছে মোহন্ত। যখন মোহন্ত ছিল এ অঞ্চলের কাহার সমাজের শীর্ষমণি। মোহন্তর কথাই তখন সমাজের কথা। ওর মুখের ওপর কথা বলা দূরে থাক, পেছনেও কেউ কিছু বলতে সাহস করতো না। কি বোল-বোলোয়া ছিল সেদিন।

বলাই একমনে শুনছে। বেশ লাগছে। এক একবার দেখছে রূপোর মুখের দিকে। কি সুন্দর রূপো। ছবির মতো। সুন্দরী রূপো। মিষ্টি মেয়ে রূপো। দুঃখ হয় ওর জন্যে। না জানি কি ওর ভাগ্যে আছে। ওই বৃদ্ধ মোহন্ত। যে তালগাছ পুঁতে সেই গাছের তাল খেয়েছে। তার নাতনী রূপো। কোন সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বলাই।

—কি ভাবতেচো ঠাকুর? মোহন্তর জিজ্ঞাসায় বলাই-এর চমক ভাঙে। বলে—না, কিছু না। যাক উঠি রাত হয়ে যাচ্ছে। অনেক পথ যেতে হবে—

—ও, এই ছ্যাখো তোমারে আটকে রেখেছি ঠাকুর। যাও, কিন্তু মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দিও। দেখতি তো পাচ্ছো আমাদের অবস্থা। কপালে কি ভোগ আছে, কেডা জানে। ছ্যাও, পায়ের ধুলো ছ্যাও।

একা মোহন্ত নয়। রূপোও পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বলাইকে। প্রণাম গ্রহণ করতে বলাই-এর বরাবরই সঙ্কোচ। তবু বাধা দিতে পারে না। পাছে যদি কেউ মনে ব্যথা পায়।

দিনকয়েক পর। ক'দিন একটানা বৃষ্টির পর রোদ দেখা দিয়েছে। ভাদ্রের মেঘ-ভাঙা রোদ। দারুণ চড়চড়ে। ওই রোদ মাথায় নিয়ে রূপো সকাল থেকে ক্ষেতে কাজ করছে। একা নয়, সঙ্গে চন্দর আর নিতাই। মেয়ে মানুষ হলে কি হবে, পুরুষের সঙ্গে সমানে কাজ করতে পারে রূপো। চন্দর, নিতাই মাঝে মাঝে

বিড়ি টানছে, বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু রূপো এক নাগাড়ে কাজ করে চলেছে।

সূর্য মাথার ওপরে উঠতে চন্দর আর নিতাই চলে গেল। রূপোর এখনো দেরী আছে। তোলা ঘাসগুলো ধুয়ে গরুর মুখে দিতে হবে। তারপর রান্না খাওয়া। আজ শুধু ভাতে ভাত। এতো বেলায় আবার কি!

গরুর মুখে ঘাস জল দিয়ে রূপো স্নান সেরে এলো। মোহন্ত বসেছিল দাওয়ায়। বলে—ভাদ্দুরে রোদে এতো খাটাখাটনি করিসনে, জ্বর-জ্বারি হবে।

—জ্বর-জ্বারি আমার হবে না দাদু। মাথার ভিজে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে রূপো বলে, তোমার খুব খিধে পেয়েচে, না? আমি তাড়াতাড়ি আলোচালের ফ্যানে ভাত রেঁধে দিচ্ছি।

—সকালে তো এক পেট পান্তা খ্যালাম। এবেলা আমার না খালিও চলত না।

—তোমার চলতো। কিন্তু আমার চলবে না। ক্ষিধেয় নাড়ি চচ্চড়ি হয়ে গেছে।

রান্না খাওয়া চুকিয়ে রূপো মাদুর বিছিয়ে শুয়েছিল। ভেবেছিল ঘুমোবে না। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙলো যখন তখন সূর্যদেব পাটে বসেছে। ইস, এতো ঘুম ঘুমিয়েছে! ঘুম থেকে উঠে দাদুকে দেখতে পেল না। কোথায় বেরিয়েছে। কিন্তু কোথায় যাবে, দাদু তো আজকাল হুট বলতে কারো বাড়ী যায় না। হয়তো চন্দর কিংবা নিতাইদার বাড়ী গেছে।

চোখে মুখে জল দিয়ে গাই গরু দু'টি গোয়ালে তুলে জাব্‌না মেখে দেয় রূপো। একটা গাইয়ের বাছুর হবে শীগ্‌গির। দু'দশ দিনের মধ্যে। গাইটা বিয়োলে সুবিধে হয়। খেয়ে দেয়েও কিছু

দুধ বিক্রী হয়। দাদুর যা শরীরের অবস্থা, একটু দুধ না হলে চলে না।

গরুর কাজ সেরে, উঠোনে জল-ছড়া দিতে সন্ধ্যে উতরে যায়। তারপর খিড়কীর পুকুরে কাপড় কাচতে গেল ঘরে শিকল টেনে।

ভিজে কাপড়ে ভরা কলসী কাঁখে নিয়ে ঘরে ফিরছে রূপো। ছাঁচতলায় নতুন সাইকেল দেখে বিস্মিত হয়। অমন চক্‌চকে সাইকেল চেপে কে এলো? হঠাৎ নজর যায় কামিনী ফুল গাছের আড়ালে। জামা কাপড় পরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি ভরা কলসী দাওয়ার কোলে নামিয়ে রেখে ঘরে ঢুকে দরজার হুড়কো লাগিয়ে দেয়। খোলা জানালা দিয়ে দেখে, লোকটি এগিয়ে আসছে। এবার চিনতে পারে। সুদাম। দাদু বাড়ী নেই. তাই তক্কে তক্কে এসেছে। কিন্তু কোথায় গেল দাদু। যেখানেই যায় রূপোকে না বলে তো কোথাও যায় না।

রূপোর মনে এলোপাতাড়ি চিন্তা। অন্ধকার ঘর। ভিজে কাপড় ছেড়ে আলো জ্বালাবে তাও পারছে না।

—দরজা খোলো রূপসা। দরজা খোলো --কথা জড়িয়ে যাচ্ছে সুদামের। নেশা করেছে। দেশী তাড়ির নেশা! বলে, তোমার দাদু চরদিয়ায় গেছে। ফিরতে অনেক রাত্তির হবে। তাইতো এইচি।

রূপো ভয় পেয়েছে! নেশাখোর মানুষ পশুর সমান। ওরা সব পারে! ভয় পেয়েও বিচার বুদ্ধি হারায়নি রূপো! ছিনে জোঁকটা আছে ঘরের বাইরে। ভাগ্যিস্, তাড়াতাড়ি দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিয়েছিল। নয়তো ঠিক ঘরে ঢুকতো ওই ছিনে জোঁকটা। ঠিক আছে, থাক ও বাইরে দাঁড়িয়ে।

জানালাটা সশব্দে বন্ধ করে দেয় রূপো। আলো জ্বালা হলো না। শুধু ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে।

দরজায় ধাক্কা মারছে সুদাম। সজোরে। জামকাঠের মজবুত দরজা। তারপর ভিতর থেকে দু'টি পাকাবাঁশের হুড়কো লাগানো।

সহজে ভাঙবে না। একটি কেন, ছ'পাঁচটা মানুষের শক্তিতেও ভাঙা অসম্ভব।

—মাইরী বলছি রূপো, একবারটি বাইরে এসো। শুধু একবার চুমো খাবো।

শির শির করে ওঠে রূপোর দেহ! কি সাহস ওই ছিনে জোঁকটার? বলে কি চুমো খাবে!

—এই রূপো, দরজা খোল না। তোমারে আমি পটের বিবি করে রাখবো, দরজায় ধাক্কা দেওয়া বন্ধ করে আবার জানালার কাছে এসেছে সুদাম। নেশার ঘোরে যা খুশী তাই বলে যাচ্ছে।

—বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। রূপো মরীয়া হয়ে চীৎকার করে ওঠে—নইলে নোড়া দে দাঁত ভেঙে দেবো।

—ইস্। বলে অশ্লীল উক্তি করে সুদাম।

রূপো আর সহ্য করতে পারে না। অন্ধকারে নোড়ার বদলে ভাঙা জাঁতি হাতে পায়। জানালার কবাট খুলে কোনো দিকে দৃকপাত না করে সজোরে ভাঙা জাঁতি ছুঁড়ে মারে সুদামের মাথা লক্ষ্য করে।

—উঃ, অস্ফুট আর্তনাদ করে সুদাম কপাল চেপে ধরে ছ'হাতে। রূপো সশব্দে বন্ধ করে দেয় জানালার কবাট। কি জানি হয়তো কপাল কেটে গেছে সুদামের। যদি রক্তের বদলে রক্ত চায়? রূপো ভাবে যদি ওই নেশাখোর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জানোয়ারটা প্রতিশোধ নিতে চায়?

রূপো আরো মনে ভাবে, রাগের মাথায় এভাবে জাঁতি ছুঁড়ে মারা উচিত হয় নি। হয়তো এখনি ওই সুদাম ছুটে গিয়ে খবর দেবে মালোপাড়ায়। যদি খবর শুনে দল বেঁধে আসে মালো পাড়ার লোক জন? যদি আসে, আসুক! না হয় মরবে, কিন্তু ইজ্জৎ নষ্ট হতে দেবেনা। কিছুতেই না।

কিন্তু মালোপাড়ার কেউ এলো না। এমন কি সুদামের উপস্থিতিও টের পায়নি আর।

মোহন্ত এলো যখন, তখন প্রথম প্রহরের শেয়াল-ডাকা রাত।

দাদুর গলার আওয়াজে রূপো দরজা খোলে। দাদুকে জড়িয়ে ধরে দু'হাতে। দুঃখে, আনন্দে, উত্তেজনায়।

--কি হয়েছে, অমন করতিছিস কেন? মোহন্ত কিছুতেই বুঝতে পারে না নাতনীর এমন ব্যবহারের অর্থ। শেষটা রূপো সংক্ষেপে বলে যায় সন্ধ্যেরাতের ঘটনা, শুনে মোহন্ত সোল্লাসে বলে ওঠে, সাবাস বেটি, ছোঁড়াডারে যদি একেবারে জখম করে দিতিস্— তবে বুঝতাম, হাঁ।

রূপো বলে—তুমি চরদরিয়ার গেছো, সে খবর ও রাখে। তাই তক্কে তক্কে এইছিল। তুমি আমারে না-বলে গেলে কেন?

—ঘুমোচ্ছিলি, তাই ডাকি নি। ভাবলাম অতো খাটা খাটুনি করে শুইছিস অবেলায়, বলে মোহন্ত গামছায় বাধা পুঁটুলি রূপোর হাতে দেয়, তোর মেসোর বাড়ী গিছিলাম। তোর জন্যি ছাঁদা বেঁধে এনিচি। আমি একপেট খেয়ে এইচি। মাংস আর ভাত। কচি পাঁঠার মাংস। তারপর তোর বাতাসী মাসীর যা রান্না! জিবে জড়িয়ে রয়েচে। আজ এখনো রান্না করিস নি তো?

—না।

—তবে তো ভালোই হয়েছে।

রাতে। মোহন্ত তামাক খেয়ে শুয়েছে! রূপোর চোখে ঘুম এখনো। কুলুঙ্গিতে কেরোসিনের কুপী জ্বলছে। বাইরে অন্ধকার। একটু আগেও চাঁদের আলো ছিল। বোধ হয় মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামবে। তালগাছটার পাতা খস খস করছে। বাতাস লাগলে ও রকম শব্দ হয়। ঘরের একটি জানালাও খুলে রাখেনি রূপো। কি জানি সেই আহত জানোয়ারটা যদি আবার আসে।

মোহন্ত জিজ্ঞাসা করে, জানালাগুলো সব বন্ধ করিচিস কেন? খুলে দে। পচা ভাদ্দরের ভ্যাপসা গরম। হাওয়া না এলে দম আটকে যাবে।

রূপো ভয়ে ভয়ে বলে, যদি মালোপাড়ার ওরা আসে!

—আসে, আসবানে। বলি আমার করবেডা কি? ওই তালের কোঁড়াটা হাতের কাছে রাখ। দেবানে সব ঠাণ্ডা করে। ওরা মুখে তড়পায়, নয় তো মালো ব্যাটাদের ক্ষেমতা আমার জানা আছে। দে, জানালা খুলে দে!

জানালা খুলে, খানিক সময় খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে রূপো। মেঘ করেছে। ঘন মেঘ। বাতাস হচ্ছে, হয়তো বৃষ্টি নামবে। আলো জ্বলছিল কুলুঙ্গীতে। দপ করে নিভে গেল। অন্ধকার। দেশালাইটা কোথায় রেখেছে, মনে করতে পারছে না রূপো। অন্যদিন বালিশের তলায় রাখে, আজ ভুলে গেছে। কুপীটা জ্বেলে বোধহয় কুলুঙ্গীতেই রেখেছে। কুলুঙ্গী হাতড়ে দেশালাই পায় না রূপো।

—আঁধারে কি খুটুর খুটুর করিস? মোহন্ত এখনো ঘুমোয় নি, বলে, নে শুয়ে পড়।

—দেশালাই খুঁজতিচি। আলো নিভে গেছে কিনা।

—কি কাজে লাগবে দেশালাই! তুই ঘুমো দিকিনি।

আজ দাদুর পাশেই শুয়েছে রূপো। যতো রাত বাড়ছে, ভয় যেন ওকে ততো পেয়ে বসছে। মোহন্ত হাত বুলিয়ে দেয় নাতনীর মাথায়। বলে, ঘুমো,—কিসের ভয়? যত সময় আমি আছি, তোর কোন ভয় নেই। জানিস আজ তোর মেসোরে সব বললাম, বলবো বলে গিছিলাম।

—মেসো কি বললে?

—বললে, যদি অসুবিধে বোঝ, রূপোরে নে তুমি এখেনে চলে এসো। কিন্তু আমি কি যাতি পারি—এই ভিটের মাটি ছেড়ে? তুই বল না, আমি কি যাতি পারি?

—কেন পারবা না?

—দূর, অমন অলক্ষুনে কথা কোস নে। এ ভিটে আমি জীবন

থাকতি ত্যাগ করতি পারবো না। বলে মোহন্ত পুরোনো দিনের গল্প সুরু করে। জিরিকপুরের বিশ্বাসদের সঙ্গে মামলায় জিতে রায়হাটের দত্তবাবুরা এই চরের মালিকানা স্বত্ব পায়। তখন কি ছিল এই চরে? শুধু শেয়ালকাঁটার ঝোপ, পিটুলি, কাঠশোলা আর ওড়চাকা গাছের জংগল। নদীর ধার-বরাবর ছিল ক্যাওড়া গাছ। সেগুলোর অনেক এখনো আছে। দণ্ডীরহাটের কাহাররা ছিল দত্তবাবুদের অনুগত প্রজা। বাবুরা উদ্যোগ করে তাদের কয়েকঘরকে নিয়ে এলেন এই চরে। বাপের হাত ধরে মোহন্ত যখন এই চরের নতুন বাড়ীতে প্রথম আসে তখন ওর বয়েস বছর দশেক হবে। এখন একশ' বছরের বেশী হবে মোহন্তর বয়স। কতো দিন হয়ে গেছে। তবু মনে হয় সেদিন। তারপর একে একে আরো কতোজন এলো। ঘর বাঁধলো এই চরে। প্রথমে কাহার, তারপর বাগ্‌দী। মালোরা হালে এসেছে। মোহন্ত এই চরপত্তনি মানুষ। এখানে তার বাবা-মা জীবন কাটিয়েছে। এই চরমুকুন্দপুরের শ্মশানে ছাই হয়ে গেছে মোহন্তর বৌ, ছেলে, মেয়ে, নাতি। সবাই গেছে। মহাকাল কাউকে রেহাই দেয় নি। শুধু বাঁচিয়ে রেখেছে মোহন্তকে। আর বেঁচে আছে বংশের একটি মাত্র রক্তধারা—রূপো।

অতীতের কথা বলতে বলতে মোহন্তর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, রূপোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—যম শুধু আমারেই ঠাওর পাইনি। কি এমন পাপ করিচি যে এখনো পাপের ভোগ ভুগতি হবে।—অ রূপো ঘুমোলি নাকি? রূপো, অ রূপো।

ঘুমিয়ে পড়েছে রূপো। দাদুর গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। মোহন্তর চোখে ঘুম নেই। পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছে। কথা নয় তো ইতিহাস। একশ' বছরের জীবন মোহন্তর। তার ইতিকথা। কী না ছিল মোহন্তর? সুখের সংসার। বৌ, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী। এমন দিন ছিল, যখন এক এক বেলায় বিশখানা পাতা পড়তো মোহন্তর বাড়ীতে। অভাব ছিল না,

ছেলেরা খাটতো খুটতো, টাকা আনতো ঘরে। দত্তবাবুরা যতো দিন ছিল্লেম, ততো দিন হাঁটুর ওপর হাঁটু দিয়ে দিন কাটিয়েছে মোহন্ত। সে সব দিন কোথায় গেল। মোহন্তর দু'টি চোখ জলে ভরে ওঠে অতীতের স্মৃতি মন্থনে। বুক ফাটা নিঃশ্বাসের পরেও বুক হালকা হয় না। পাষাণের ভার মোহন্তর বুকে। জীবন থাকতে এ-ভাব নামবে না।

রাত ভোর হয়েছে। রূপো এখনো ঘুমোচ্ছে। কলকেয় ঘুঁটের আগুন দিয়ে ফুঁ দিচ্ছে মোহন্ত। রাত থেকে আকাশে মেঘ জমে আছে। এখনো সেই জমাট বাঁধা মেঘ। এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি। যে রকম গুমোট তাতে বৃষ্টি না হয়ে যাবে না।

তামাক টেনে আরাম করে মোহন্ত। রাতে ভাল ঘুম হয় নি, চোখ জ্বালা করছে। তারপর তলপেটে মৃদু বেদনা। কাল রূপোর মেসো গোকুলে বাড়ী খাওয়াটা বেশী হয়েছিল। এ বয়সে অতো খাওয়া সহ্য হবে কেন!

অন্যদিন গরু বার করে গোয়াল পরিষ্কার করে রূপো, মোহন্তকে একবার ফিরেও দেখতে হয় না। আজও রূপো করতো। কিন্তু কি খেয়াল হলো মোহন্তর। আজ নিজে গেল গোয়ালে। গরু বার করে গোয়াল পরিষ্কার করলে।

রূপো ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসেছে। দাদুকে গোয়ালে ঝাঁটা হাতে দেখে জিজ্ঞাসা করে ওকি, তোমারে ওসব কেডা করতি বললে?

—তুইতো ফি দিন করিস। একদিন আমি না হয় গা নাড়া দেলাম। বসে বসে বাত হবার জোগাড়।

—ধাড়ী গরুডা সব জাব্‌না খায় নি। অতো জাব্‌না দিসনে। বোধ হয় আজ কালের মধ্যেই বাছুর হবে।

মোহন্তকে আজ কাজে পেয়েছে। রূপোর কোনো কথা শোনে নি। সকালে গোয়ালের কাজ সেরে কাস্তে হাতে গিয়েছিল

নদীর চরে ঘাস কাটতে। ফিরলো দুপুরের রোদে ঘাসেব বোঝা মাথায় করে।

রূপো দাঁড়িয়ে ছিল রান্নাঘবের ছাঁচতলায়! অবাক হয়ে দাত্থর কাণ্ড কারখানা দেখে। মোহন্ত গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বলে, দেখতিচিস, কি হাঁ করে? তোব বাপেব বাপ আমি। এখনো ওই সুদামের মতো দশ বিশটা জোয়ান ছেলেব ঘাড়ে বদ্দা মেরে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি। ড্যাক্‌রাবা বাপের নাম ভুলে যাবে।

—যাও, এখন কথা না কয়ে বিশ্রাম করে চান করো গে।

—কতোডা ভাত রেঁধেছিস্? দেখিস আজ গরুর মতো কতোডা ভাত খাবানে। গতর না খাটালে কি ক্ষিধে হয়?

রূপো না দাঁড়িয়ে থেকে সরে যায়। না গেলে দাত্থব কথা ফুরোবে না। কথায় কথায় গল্প আরম্ভ হলে আব রক্ষে নেই। চললো তো চললো গড়গড়িয়ে। বুড়ো মানুষ, বেশী কিছু বলতেও পারে না রূপো। মা যেমন ধমকায়, রূপোও তেমনি ধমক দেয় মোহন্তকে। মায়ের বকুনি আদুরে ছেলে শুনবে কেন!

সন্ধ্যার আগে বলাই ঠাকুর ফিরছে গুলাইচণ্ডীর হাট থেকে। আড়াআড়ি পথে পাথরঘাটার ভেড়ি দিয়ে আসছে। চরমুকুন্দপুর এসে গেছে। পরেই মাঠ। মাঠেব পথ পেরোলে নলকুঁড়ো।

হাট থেকে বেরোবার সময় আকাশ ছিল পরিষ্কার। ভেড়ি পথে মাইল খানেক পথ আসতেই দেখে আকাশের কোণে জমাট বাঁধা মেঘ। ঐ ধূসর রঙের মেঘে বৃষ্টি হয়। দেখতে দেখতে মেঘ ছড়িয়ে পড়লো সারা আকাশে। বৃষ্টি নামবে। নামুক। দ্রুত পা চালায় বলাই। সন্ধ্যে হয়ে এলো। না আছে আলো, না আছে ছাতা। ভেড়ি পথে সাপের উৎপাত। চিন্তা হয়, কোন সময় ফোঁস করে উঠবে। কেউটেগুলো বেশীর ভাগ থাকে এইসব জায়গায়। কামড়ালে আর রক্ষে নেই। ভেড়ি পথ এক রকম শুকনো। বলাই হাঁটছে ছুটে চলার মতো।

শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টি এলো বলে। গাছপালার একটি পাতাও নড়ছে না। গুমোট গরম। সারাদেহে ঘাম ঝরছে বলাই-এর।

চরমুকুন্দপুরে পৌঁছতেই বৃষ্টি এলো। খানিক সময় দেখে যাওয়া যাক্। পথের ওপরেই পাঠশালা। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো বলাই। আরো ক'জন দাঁড়িয়ে আছে আগে থেকে।

—কেডা, ঠাকুর নাকি ?

—হাঁ। বলাই গায়ের ঘাম মোছে কোঁচার খুঁটে। ওখানে কারা ?

—আমি বিন্দাবন। জীবন, পেঁচো আর নাটু আছে। তুমি কম্‌নে গিছিলে ঠাকুর ?

—গুলাইচণ্ডীর হাটে।

—বাড়াতে কুটুম-টুটুম এয়েচে নাকি ! মাছ কিনেচো ?

—গোটাকতক পাতাড়ির বাচ্চা পেলাম, তাই নিয়েছি।

—কি দর ?

—সুবিধে হয়েছে। তারপর তোমরা কোথেকে বৃন্দাবন ?

—সুদামের আখড়ায় যাচ্ছি।

সুদামের যাত্রাদল প্রসঙ্গে বৃন্দাবন বলে, যাত্রা যদি করতি পারে সুদাম, তা হলি শুনো! এ তল্লাটে এমন যাত্রা হয়নি। বলি কোলকাতার আনন্দ অপেরার কংস বধ পালা শুনেচো ?

—না ভাই, যাত্রা-টাত্রা আমি শুনিনে। তারপর তোমাদের আর খবর কি—ভালো তো ?

—আমাদের আব খবর! চরমুকুন্দপুরের খবর তো এখন রূপোর ঘরে।

এতোসময় বৃন্দাবন কথা বলছিল। এবারে গলার আওয়াজে মনে হয় নাটু। টিপ্পনি কেটে বলে—ঠাকুরের কাছে রূপোর নিন্দে কোরোনা বেন্দাবন। ওই রূপোর বাড়ীতেই ঠাকুরের পান জল খাবার জায়গা।

এরা যে এমন অভব্য মন্তব্য করতে পারে, তা ধারণার অতীত।

সাধারণতঃ বলাই শান্ত প্রকৃতির। বিশেষ কোনো কারণ না ঘটলে উত্তেজিত হয় না। নাটুর কথাতেও বলাই উত্তেজিত হলো না। শুধু বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবে, তার বাবা এ অঞ্চলের পুরোহিত এবং সম্মানীয় মানুষ। আর তাঁরই ছেলে বলাই, তার সম্পর্কে এমন কথা মুখের ওপর বলতে পারলো এরা!

—এখেনে না দাঁড়িয়ে, যাও না ঠাকুর রূপোর বাড়ী, দু'দণ্ড কথা বলে শান্তি পাবানে।

এ কথা নাটুর মুখ থেকে শোনার পরেও বলাই নীরব।

এবার পেঁচো বলে, তুমি তো ভালো পুতুল গড়তি থারো, শুনিচি তুমি নাকি তোমার মায়ের মূর্তি গড়েছো। তা এবারে রূপো ছুঁড়ির মূর্তি গড়ো না? ছুঁড়ির তো রূপের চটক আছে।

এতক্ষণে কথা বলে বলাই। বলে, রূপোর পায়ের নখের যোগ্য তোমরা নও। বুঝেছো?

বলাই-এর কথা শুনে বৃন্দাবন হো হো করে হেসে ওঠে। আর নাটু মুখ দিয়ে বিদ্‌ঘুটে শব্দ করে। পেঁচো যা বলে, শুনে বলাই কানে আঙুল দেয়।

কথায় কথা বাড়বে। এখানে না দাঁড়িয়ে বলাই বৃষ্টি মাথায় পথে নামে। টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে। এমন কিছু না। কিন্তু ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। যদি বিদ্যুৎ চমকাতো, তাতেও মাঝে মাঝে পথ দেখা যেতো।

মনসাতলার মোড়ের কাছে পৌঁছে বলাই-এর সঙ্গে দেখা হলো সুজয়ের। সাইকেলের স্তিমিত আলোয় বলাইকে দেখতে পেয়ে সুজয় নেমেছে। সুজয়ও বৃষ্টি মাথায় সাইকেল চালিয়ে এসেছে। ভিজে চাপুর চোপর।

সুজয়ের সঙ্গে বলাইর বন্ধুত্ব নিবিড়। ওরা একই সঙ্গে পড়েছে গ্রামের পাঠশালায়। শহরের ইংরাজী স্কুলেও ক'বছর এক সঙ্গে পড়েছে। পাশ করা কারো ভাগ্যে ঘটে নি। সুজয় সপ্তম শ্রেণীতে উঠে পড়া ছেড়ে দেয়, আর বলাই ম্যাট্রিক দিয়েও পাশ করতে পারেনি। ছোটোবেলা থেকে ওদের বন্ধুত্ব।

সুজয় জিজ্ঞাসা করে, কোথায় গিছলে ?

—গুলাইচণ্ডীর হাটে। তা তুমি বৃষ্টি মাথায় বেরোলে ?

—মাঝ পথে বৃষ্টি এলো। সুজয় বলে, এসো না আমাদের বাড়ী।

—না। মাছ নিয়ে যাচ্ছি, বাড়ীতে কুটুম্ব আছে। বলাই বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করেই রূপোকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে সে সব কিছু না বলে, জিজ্ঞাসা করে—রূপোর সঙ্গে দেখা করবে তো ?

—হঠাৎ ওকথা জিগ্যেস করলে ! ব্যাপার কি ?

—কিছু না। আচ্ছা যাই ভাই, রাত হয়ে যাচ্ছে। অনেক পথ যেতে হবে।

—মাঝে মাঝে বসিরহাটের হাটে তো যাও। একদিন না হয় গরীব বন্ধুর দোকানে পায়ের ধূলো দিলে। একে বন্ধু, তার ওপর বামুন। যেয়ো কিন্তু।

—নিশ্চয়ই যাবো। বলে বলাই চলতে আরম্ভ করে।

যে কথা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেনি বলাই, আজ রাতে বিছানায় শুয়ে তাই ভাবছে। মূর্তি গড়বে বলাই। একটি মেয়ের মূর্তি। মেয়েটি আর কেউ নয়, চরমুকুন্দপুরের মোহন্ত কাহারের নাতনী রূপো। রূপসী।

রূপোকে অনেকবার দেখেছে বলাই। খুব কাছ থেকে। আবার দেখবে শিল্পীর চোখ নিয়ে। মনের গোপনে তার ছবি এঁকে তবে তৈরী করবে মূর্তি।

মিষ্টি মেয়ে রূপো। মিষ্টি তার নাম। সুন্দরী সে। রূপসী। টানা টানা তার চোখ দু'টি। দীঘল কালো চুল—এলিয়ে দিলে কোমরের নীচে নেমে আসে। টিকোলো নাক। রং ফর্সা নয়। শ্যামল-বরণী। সবচেয়ে ভালো লাগে তার মিষ্টি হাসি।

রূপোর মূর্তি গড়বে বলাই। মাটি, রং আর তুলি দিয়ে তিলে তিলে গড়বে রমণীয় রূপোর মূর্তি।

চিন্তার মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তা ও নিজেই জানে না। ঘুম ভাঙলো শেষ রাতে। ঘুম-ভাঙা মনে রাতের চিন্তার রেশ। কিন্তু রাতের অন্ধকারে স্বপ্নের জাল বোনা যতো সহজ, দিনেব আলোয় তেমন নয়। তবুও বলাই-এব মনে স্থির আশা, চরমুকুন্দপুরের মেয়ে রূপোর মূর্তি ও গড়বেই।

অন্য দিনের মতো আজো ভোরে উঠে গোয়ালের গরু উঠানে বেঁধে দিয়েছে রূপো। পরিস্কার করেছে গোয়াল, উঠোন। তারপর গোবর জলে ন্যাতা ডুবিয়ে নিকোচ্ছে ঘরের ধাবি, দাওয়া। মোহন্ত বাড়ী নেই। ভোব উঠে বেড়াতে গেছে। ভোরে উঠে বেড়ানো মোহন্তর অনেক দিনেব অভ্যেস। বর্ষায় চরে জল জমেছে, কাদা হয়েছে পথে—তবু বেড়ানো চাই। ওই এক বাতিক।

—টুং টুং·· সাইকেলের ঘণ্টা শুনে রূপো ফিবে তাকায়। সুজয় এসেছে। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি গোবব-জল মাখা হাতে কাপড় চোপড় ঠিক করে নেয়। সুজয় আসবে, এ যে ধারণার অতীত।

কামিনী গাছের গোড়ায় সাইকেল রেখে সুজয় এগিয়ে আসে দাওয়ার কাছে। বলে, একেবারে লজ্জাবতী লতা।

কথা না বলে রূপো আড়-চোখে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে। সুজয় দাওয়ায় উঠতে উঠতে বলে, ওই গোবর জল মেখে বসে থাকবে নাকি? যাও, গা ধুয়ে কাপড় চোপড় কেচে এসো।

—ঘরে গিয়ে বোসো। আমি কাপড় কেচে আসতিছি। এ্যাদ্দিনে আমার কথা মনে পড়েছে।

—তোমার কথা সব সময়ে মনে থাকে রূপো। কিন্তু কি করবো বলো। কাজের চাপে নিজের কথাই ভুলে যাই। যাও, এসো তাড়াতাড়ি। চা চিনি এনেছি। তুমি চা করবে, আমি খাবো।

—আমি চা করতি পারি নাকি? তোমার যেমন হয়েছে। বলে রূপো আলনা থেকে গামছা টেনে নিয়ে হনহনিয়ে চলে যায়। পথে যেতে যেতে ভাবে, এতো কাণ্ড ঘটার পরেও সুজয় এলো, তবে কি সে কিছু শোনেনি? না, শুনেও এসেছে! হয়তো তাই। সুজয় শহরে থাকে, তাই তার মনটা আর ছোট নেই। আর যদি না শুনে থাকে, তা হলে—

ভালো মন্দ, অনেক কিছুই ভাবে রূপো। তার সব ভাবনা শেষ হয়ে যায় আনন্দে। সুজয় এসেছে ওর কাছে এই তো যথেষ্ট।

কাপড় কেচে নয়, একেবারে স্নানের পাট চুকিয়ে রূপো বাড়ী এলো। সুজয় এসেছে। ওর মনের মানুষ সুজয়। আজ নাই-বা করলো ক্ষেত খামারের কাজ। এমনিতে কেটে যাক না একটা সকাল। উঠোনে দাঁড়িয়ে মাথা মুছে ভিজে কাপড়ে দাওয়ায় ওঠে রূপো। ইস্, শুকনো কাপড় রয়েছে ঘরে। ভিজে কাপড় লেপ্টে আছে দেহের সঙ্গে। কেমন করে যাবে ঘরে, সুজয়ের সামনে?

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রূপো বলে—ওই দড়ির আলনা থেকে একটা শুকনো কাপড় দ্যাও দিকিন।

—কোন শাড়ীটা দেবো?

—যেটা তোমার পছন্দ।

লাল ডুরে শাড়ীটা সুজয় দিয়েছে জানালা দিয়ে। হাতে হাত দিতে গিয়ে রূপোর একটি আঙ্গুল টিপে দিয়েছে। আঙ্গুলের ডগায় এইটুকু ছোঁয়া রূপোর হৃদয়ে গিয়ে পোঁছেচে।

রূপো অনুভব করে এই সামান্য স্পর্শের স্বাদ। অনাস্বাদিত।

কাপড় ছেড়ে ভিজে চুল ঝেড়ে ঝুড়ে পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়েছে রূপো। পা দু'টি কি রকম ফ্যাক ফ্যাক করছে। আলতা পরলে মন্দ হতো না। আলতার শিশি রয়েছে বাক্সে। সুজয়ের সামনে পরবে কেমন করে? চুল আঁচড়ানোও দায়। আয়না চিরুনি সবই ঘরে।

সুজয় বোধহয় বুঝতে পেরেছে রূপোর অসুবিধের কথা।

বলে, আমি তোমার বাগানটা দেখে আসি রূপো। গেল বছরের মতো শশা গাছ করেছো তো?

রূপো জানায়, বাগানের পশ্চিম কোণে মাচায় শশা গাছ হয়েছে। ফলছে প্রচুর।

বাগান বেড়িয়ে কচিশশা চিবোতে চিবোতে সুজয় ফিরে এলো ঘরে। ততক্ষণে সাজগোজ সারা হয়ে গেছে রূপোর। আলতা পরেছে, সিঁথির কাছের চুল আচড়ে আলগা খোপা বেঁধেছে। দুই ভ্রূর মাঝে ধুনোর আঠা দিয়ে পরেছে কাঁচ পোকার টিপ।

সুজয় চকিতে রূপোকে দেখে নিয়ে বলে, বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে। যেন পরীর দেশের মেয়ে।

রূপো হাসে। ওর হাসিটা বরাবরই সুন্দর। ছোটবেলায় রূপো যখনই হাসতো সুজয় টিপে দিতো ওর গাল। বলতো—তোর মতো যদি আমি হ'তাম। ভারী মজা হতো।

রূপো বলতো—ধ্যেৎ, তাই আবার হয় নাকি?

দু'টি একটি কথা নয়, ছোটবেলার আরো কতো কথা জমা হয়ে আছে ওদের মনে। কেউ ভোলে নি। রূপোর আজ নতুন করে মনে পড়ছে সেই ছোটবেলাকার কথা। বলে বড়ো হলি মানুষ আরো ছোট হয়ে যায়, না?

—আমরা কেউ কারো কাছে বড়ো হই নি রূপো। হবো না।

—না, তুমি আবার বড়ো হওনি! দাড়ি গোঁফ উঠেছে, সাটিনের জামা গায়ে ছাও, শহরে দোকান দেছো. শহরের মানুষের মতো শুদ্ধ করে কথা বলো। তারপর—তারপর বাইসকোপের ছবি ছাখো। আরো কতো কি বলবো।

—তুমিও বড়ো হয়েছো রূপো। বলবো তোমার কি কি হয়েছে?

—না, বলতি হবে না। একটু থেমে রূপো বলে, আমারে একদিন বাইসকোপের ছবি দেখাবা। একবার দেখিচি। ভ্যাবলার হাটখোলায় যেবারে তাঁবু ফেলে হইছিল। আমি তখন খুব ছোট।

দেখতি ইচ্ছে হয়, দাদুরে এতো বলি, নে যায় না। বলে, ছবি দেখে কি করবি? মানুষ দেখে হচ্ছে না?

—শহরে আমার সঙ্গে একা যেতে ভয় করবে না?

—তুমি বাঘ নাকি, যে ভয় করবো? কবে নে যাবা বলো?

—সুদাম মালোও তো বাঘ না, মানুষ—তবে ওরে অতো ভয় করো কেন?

সুদামের নাম শুনেই রূপোর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। সুজয় জানায়, সে নিতাই-এর মুখে সবই শুনেছে। কাল রাতে চন্দরের সঙ্গে দেখা হতে সেও বলেছে সব কথা।

গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে রূপো বলে—আমার যে কি কষ্টে দিন কাটিতেছে, তা যদি জানতে!

—কষ্ট আবার কি! ও সব চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলো। কোনো কথায় কান দিও না। দিন এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কবে আসবে সেদিন! সেকথা মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারে না রূপো। শুধু দু'টি চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকায় সুজয়ের মুখের দিকে। ওই সুজয়ই যে ওর যা কিছু। সব কিছু ভুলতে পারে ওর মুখ চেয়ে। সুজয় যে ওর মনের মানুষ।

—কই, উনুন জ্বালবে না? চা খাবো বলে যে কাগজের মোড়ক করে চা চিনি এনেছি। দুধ আছে তো ঘরে?

—ছাগলের দুধে চা খাও তো দুয়ে আনি। খাবা?

—তাই নিয়ে এসো।

মোহন্ত বেড়িয়ে ফিরেছে। উঠোন থেকে জিজ্ঞাসা করে, কার সাথে কথা কোস্‌রে রূপো? ঘরে কেডা?

সুজয়ই উত্তর দেয়।—ঠাকুর্দা, আমি সুজয়।

—সুজো! রসিকের ছেলে সুজো! বেশ, বেশ! বলতে বলতে মোহন্ত ঘরে ঢোকে। কবে এলি তুই?

—কাল সন্ধ্যের পর এইছি। ভালো আছেন তো?

—ভালোই তো ছিলাম। গাঁয়ের লোক আর ভালো থাকতি

দেচ্ছে কই ? তোর বাপ অব্দি আমার পেছনে লেগেছে। বলি আমিতো কারো সব্যনাশ করিনি, তবে পেছনে লাগা কেন।

ছাগল দুয়ে দুধ এনেছে রূপো। চায়ের জন্যে জল গরম করছে তোলা উনুনে, শুকনো পাতা জ্বেলে। সুজয় জলের পরিমাণ দেখে বলে, আরো জল দাও রূপো। ঠাকুর্দাও খাবেন চা।

চায়ের কথা মোহন্তর কানে গেছে। বলে, চা একবার খেইছিলাম বাবুদের বাড়ীতে। কি সুগন্ধ। তারপর হাটে বাজারে এতো চা খেইচি, কিন্তু তেমন সুগন্ধর নেদর্শন পাইনি।

চা ছাঁকছে রূপো। সুজয় বসে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছে, নয়তো বাবার কালে কি কখনো চা করেছে ও ? লালচে চা দুধ মেশাতেই সোনার মতো হয়ে গেল। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ছেড়েছে চায়ের। ঠিক যেন ফুলের গন্ধ।

চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে মোহন্ত বলে ওঠে, বাঃ, সেই বাবুদের বাড়ী খেইছিলাম, আর এই খাচ্ছি। বুঝলি সুজো, তখন বাবুদের কতো বোল-বোলোয়া ছিল। ছোট কত্যা বিশুবাবুরে তো তোরা দেখিছিস ?

—কই না তো।

—আমারি ভুল হয়েছে, বলে আপন মনে হেসে ওঠে মোহন্ত। তোরা তো কালকের ছেলে। দেখবি কোত্থেকে ? আর আমি ওই বিশুবাবুরে ভুমিষ্টি হতি দেখিচি। যে রাতে ছোট কত্যা হলেন সে রাতে কি বিষ্টি, কি বিষ্টি ! আকাশ ভেঙে বিষ্টি হচ্ছিল। শহর থেকে পাঁশ করা ধাই এয়েচে তিনজন। সাদা সাদা ঘেরাটোপ পরা। ঘেরাটোপগুলো দেখতি ঠিক সেমিজের মতন. আমিই পালকি নে গিছিলাম শহরে। পাছে বিবিদের কষ্ট হয় তাই খাস বেহারা হলেও নিজে কাঁধ দিছিলাম। পালকিতে উঠে বিবিদের সে কি হাসি। নাড়ি ছিঁড়ে যাবার জোগাড়। ছেলে হলি পর বাবুরা আমারে পাঁচ টাকা বখশিস দেলেন। আর

একখানা দামী শাড়ী। বড়ো মান্ষের বেপার আলাদা। কি বলিস সুজো!

সুজয় বলে, সে সব দিন কাল আর নেই ঠাকুর্দা। এখন সবাইরে ভেবে খেতে হয়।

—আরে, ভেবে খাওয়া ভেবে চলাতো ভালো। মোহন্ত বিজ্ঞ-জনোচিত ভংগীতে চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, মান্ষে যদি ভেবে চলতো, তাহলে মান্ষের আর দুঃখু কি? আর দুভ্যাবনাই বা ভাবতো কেডা? জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন কি কেউ আগু পিছু ভাবে? মনে করে চিরকাল বুঝি টানা জোয়ার বইবে। ভাঁটার টানে যখন সব শুকিয়ে যায়, তখন চেতনা হয়। হলি কি হবে! তখন কেবল হা-পিত্যেশ করা সার। দত্তবাবুদের তো দেখিচি, এমন দিন ছিল যখন সিন্দুক বোঝাই থাকতো টাকা। কিন্তু বান ডাকলে কতোক্ষণ। ছয়লাপ হয়ে গেল সব। হলোও তেমনি।

সুজয়কে অন্যমনস্ক দেখে মোহন্ত বলে, কি রে, শুনতিছিস নে?

—এ সব কথা তো অনেকবার শুনেছি ঠাকুর্দা।

—শুনিচিস তো আবার শোন। রামিয়ণ মহাভারতের কথা যেমন পুরানো হয় না, এও তেমন। আর এ সব যে সত্যি কথা।

রূপো ছুতো খুঁজছিল। কি করে দাদুর কাছ থেকে সুজয়কে কাছে ডাকা যায়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি আসে মাথায়। বলে, দাদু ছাগলডা পুকুর পাড়ে ঘাসের জায়গায় বেঁধে দে আসবা? আমি চান করে এইচি, নইলে—

রূপো আর সুজয়কে একনজরে দেখে মোহন্ত হো হো করে হেসে ওঠে, বুঝিছি, আমি বুঝিছি। যাই ছাগল বেঁধে দে বাগান বাগিচে দেখিগে।

—গামছা মাথায় দে যাও। নইলে মাথা ধরবে ভাদ্দুরে রোদে।

—রোদে পুড়ে, জলে ভিজে এ মাথা পাকা বেল হয়ে গেছে। বলে মোহন্ত চলে গেল।

সুজয় বলে, তুমি যেন কি ! ঠাকুর্দা কি ভাবলেন বলতো ?

—ঘোড়ার ডিম ! ভেবেছে না হাতী। রূপো কি যেন চিন্তা করে খানিক। তারপর বলে, তুমি ভদ্দরলোকের মতো বেশ আপনি-আপনি বলতি পারো। কিন্তু দেশ গাঁয়ে তো সবাই তুই-তোকারি করে। বয়েসের খুব কম বেশী হলি, বলে তুমি।

—বুড়োদের আপনি বলতে হয় রূপো। তুমি বললে খারাপ দেখায়।

—আমি তো দাত্বরে তুমি বলি।

—তোমার দাত্ব, তুমি বলতে পারো। তা বলে আমি পারি নে।

এ-কথা সে-কথায় সময় কেটে যায়। তবু কথা শেষ হয় না। খৈ ফুটছে রূপোর মুখে। এমন প্রাণ খুলে কতোদিন পর সুজয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারছে। কতোদিন পর, সুজয়কে ও পেয়েছে নিজের এক্তিয়ারে।

কিন্তু সুজয় কাজের মানুষ, সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে যাবে বসিরহাটে। পরের লোকের ওপর ভরসা করে দোকান রেখে আসা। নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকা কি তার চলে ?

রূপো বলে, এ্যাদ্দিন পরে এলে, বোসো না আর খানিক !

—উপায় নেই রূপো। আবার শীগগির একদিন আসবো। তোমারে আর টগরকে শহরের বায়স্কোপে নিয়ে যাবো ! কেমন ?

—মনে থাকবে তো আমার কথা ! চোখের আড়ালে গেলেই তো ভুলে যাবা। শহরে থাকো—আরো কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলো না রূপো। সুজয়ের দিকে চোখ রাখতেও পারছে না। বোবা কান্নার আবেগ ওকে উতলা করে তুলেছে। অকস্মাৎ এ কি হলো ওর ! দেখতে দেখতে দু'টি চোখ ছল ছল করে ওঠে।

—কিছু বলবে ? সুজয় বুঝতে পেরেছে যে রূপো কিছু বলতে চায়, যা ও কিছুতেই বলতে পারছে না মুখ ফুটে।

—তুমি কি কিছু বোঝো না ? বলে আচলে চোখ মোছে রূপো।

—কিন্তু কাঁদছো কেন?

—আমার মনে যে কি দুঃখু, তা যদি বুঝতে, তা হলি ও কথা বলতি পারতে না। পাড়ায় বেরোতে পারি নে। লোকে ছি ছি করে। পাড়ার কেউ এ বাড়ীতে আসে না। টগরও না। আমার চরিত্তিরে নাকি কলুঙ্কে পড়েছে। আমি না হয়ে অন্য মেয়ে হলি গলায় দড়ি দে মরতো। মরতি পারবো না আমি। এমন সাধের জীবন অকালে নষ্ট করতি পারবো না।

—কি ছেলেমানুষী করছো!

—তুমি পাথর, তাই বুঝতি পারো না। মাথা নীচু করে রূপো দাঁড়িয়ে থাকে। ওর চোখের জল ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে মাটিতে।

সুজয়ের অপেক্ষা করবার অবসর নেই। এখনি বাড়ী গিয়ে নেয়ে খেয়ে বেরোতে হবে। তাছাড়া রূপোর এ কান্না এখনি থামবে না।

—আবার আসবো। বলে সুজয় চলে গেল। খানিক সময় অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থেকে রূপো আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো। কিছুতেই থামে না ওর কান্না।

—অ রূপো, পান্তা টান্তা দিবিনে? মোহন্ত এসে দাঁড়িয়েছে রূপোর পিছনে। দু'হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে রূপো কাঁদছিল। মোহন্ত অবুঝ নয়। ঠিকই বোঝে কেন কাঁদছে আদরের নাতনী। তাই রূপোর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলে, সুজো বড়ো ভালো ছেলে। ওর বাপ ওরকম টেন্ডাই মেন্ডাই করলি কি হবে, দেখিস সুজো ঠিক পথে চলবে। নে ওঠ, আমারে পান্তা দিবি চল। ক্ষিধেয় নাড়ি চোঁ চোঁ করতেছে।

চোখের জল যেমন ঝরে, তেমন শুকিয়েও যায়। দাদুরে পান্তা ভাত আর তেঁতুল গুড় দিয়ে রূপো দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের কোণে। অন্যদিন রূপোও দাদুর সঙ্গে পান্তা ভাত খায়। আজ তার ব্যতিক্রম ঘটেছে দেখে মোহন্ত বলে, কি হলো, তুই খাবি নে?

—খাতি ইচ্ছে হচ্ছে না।

—এই জন্যি বলে মেয়েমানুষ। তোদের যতো রাগ পড়ে ভাতের ওপর। মন টন খারাপ হলি আমার তো বেশী খাতি ইচ্ছে হয়। আয় খাবি আয়! রাগ করে কি করবি? পেরজাপতি যদি সুজোর সঙ্গে তোর বে ঘটায, তবেই ঘটবে। নইলে কেউ কিছু করতে পারবে না। কই দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তুই মুখ গোমড়া করে থাকলি আমারো মন খারাপ হয়ে যায়।

সকাল বিকেলের মতো সন্ধ্যেও চলে গেল নিঃশব্দে। আজ সারাদিন বসে বসে কাটিয়েছে রূপো।

রাত হয়েছে। প্রথম প্রহরের শিয়ালগুলো ডেকেছিল অনেক আগে। দ্বিতীয় প্রহরও বোধহয় শেষ হয়ে এলো। মোহন্ত ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে। একটা টিকটিকির যেন কি হয়েছে, বারে বারে ডাকছে। কি জানি, কেন ডাকছে। ঘুম নেই রূপোর চোখে। চোখ দুটো জ্বালা করছে। মনের মধ্যেও জ্বালা। দু'বার কলসী থেকে জল গড়িয়ে খেয়েছে। ঘাড়েও দিয়েছে জলের হাত। তবু ঘুম আসছে না। যতো রাজ্যের চিন্তার জটলা মনের মধ্যে। সেই সঙ্গে অজানা শঙ্কা। যেন কালো ডানা মেলে একটা শকুন আসছে। কিন্তু ওই সুদাম মালো, ও যে শকুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

যতো সব আজগুবি চিন্তা রূপোর মনে। পাশ বালিশটা সজোরে বুকের মধ্যে আকড়ে ঘুমোবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ও।

অন্যদিনের চেয়ে আজ দেরীতে শয্যা ত্যাগ করেছে রূপো। ঘুমোয়নি সারারাত। তবু শুয়েছিল বালিশ আকড়ে। দেহে মনে বিশ্রী অবসাদ। ভালো লাগছে না কি । কোনো কিছুতে মন নেই। ছোট জীবন, সামান্য ওর আশা। তাও বুঝি পূর্ণ হবার নয়।

রূপো বাইরের দাওয়ায় চুপ করে বসে আছে। ঘরে-বাইরের বাসি কাজ পড়ে আছে। থাক। কাজের কথা নয়, রূপো ভাবছে অন্য কথা। ভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

রাঙাচিতের বেড়ার ফাঁকে পরিচিত মুখ দেখতে পায় রূপো। বলাই ঠাকুর আসছে। বোধহয় এই দিকেই।

উঠোনের মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়ায় বলাই। অপলক দৃষ্টিতে দেখে রূপোকে। রূপো বসে আছে। ঘুম-ঘুম চোখ! যেন অবসন্ন নায়িকা। মাটি দিয়ে মূর্তি গড়বে ওই মেয়ের। রূপসী মেয়ে রূপো!

—কি দেখতেছো অমন করে?

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে মুগ্ধ বলাই। শিল্পীর চোখ দিয়ে ও আজ দেখেছে রূপোকে। দেখছে। রূপো আবার জিজ্ঞাসা করে, অমন করে ছ্যাখো কি?

—তোমাকে।

—আমাকে! তুমি কি বলতেছো ঠাকুর?

—হাঁ। সহজ সরল মানুষ বলাই। সহজ ভাষায় বলে, আমি তোমার মূর্তি গড়বো!

—কি সব্যনেশে কথা গো! বিস্ময়ভরা কণ্ঠে রূপো বলে, বামুনের ছেলে হয়ে তুমি ক্যাওরা মেয়ের মূর্তি গড়বা? ও কথা আর বোলো না। যেন আর কেউ না শোনে। গায়ে কালি ঢেলে দেবে!

—দেয় দেবে! বলাই আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলে—আমি ভয় করিনে কাউকে। তবে তুমি যেন আমার মুখে কালি দিও না।

—আমার সব্যাঙ্গে কালি ল্যাপা! বলে রূপো ঘর থেকে কম্বলের আসন এনে পেতে দেয় জলচৌকির ওপর।—বোসো ঠাকুর!

চৌকির ওপর বসে বলাই বলে, আমি কিন্তু ওই কথা বলবো বলে এসেছি। তোমাকে না জিগেস করে তো তোমার মূর্তি গড়তে পারবো না।

—তুমি কি পাগল হলে ঠাকুর! আমার মূর্তি গড়বা কেন? রূপো কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না বলাই ঠাকুরের কথা। বলে, ঠাট্টা করতেছো তাই বলো!

—আমি মিথ্যে কথা অকারণে বলতে চাইনে রূপো।

—কিন্তু এ তোমার কোন দিশী কথা ঠাকুর! তুমি আমার মতো মেয়ের—

কথা শেষ করতে পারে না রূপো। বলাই বলে, একটা দিন যদি তোমারে সামনে বসিয়ে রাখতে পারতাম!

—ও বাব্বাঃ, ওসব আমি পারবো টারবো না। তুমি মাটি চটকে মূর্তি গড়বা আর আমি তোমার সামনে পুতুলের মতো বসে থাকবো? কি যে তুমি বলো ঠাকুর!

—ঠিকই বলছি। রূপোর মুখের দিকে তাকিয়ে বলাই বলতে থাকে, যদি মনে করা যায় জীবন জলের মতো পরিষ্কার, তাহলে সব কিছু সহজ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ তা কিছুতেই মনে ভাবতে পারে না। যদি পারতো তবে পৃথিবীটা স্বর্গ হয়ে যেতো।

—বাঃ, তুমি তো বেশ ভালো ভালো কথা বলো। এতো বিদ্যে তোমার! যাক্, যা বলো তা বলো, আমার মূর্তি তুমি গড়ো না। যদি কেউ জানতি পারে তাহলে কেলেঙ্কারীর একশেষ।

—কেলেঙ্কারীর কি আছে! আমার চোখে তোমারে ভালো লেগেছে তাই মূর্তি গড়ছি। এতে দোষের কি আছে? তা ছাড়া লোকের কথায় আমার কিছু যায় আসে না। লোকে তো অনেক কথাই বলে।

রূপো খানিক সময় বসে কি ভাবে। তারপর মাটিতে নখের আঁচড় টানতে টানতে বলে, দেখো ঠাকুর, আগুন নে খেলা করতি গে শেষটা পুড়ে মর না। আমি তো ছ্যাচ্‌কা পোড়া হয়ে মরতিছি।

—মরবো কেন? মরবার জন্যে কি এই পৃথিবীতে জন্মেছি? এতো ফুল ফোটে, এতো পাখী গান গায়, সূর্য ওঠে, চাঁদ ওঠে—সুন্দর এই পৃথিবী। এখানে এসে মরণ কামনা করবো কেন? জানো রূপো, জীবন আছে বলেই তো জীবনের এতো দাম!

বলাই-এর কথাগুলো রূপোর মর্মে গিয়ে পৌঁছয়। কী চমৎকার

কথা! জীবন আছে বলেই তো জীবনের দাম! বলে, তোমার কথাগুলো বেশ ঠাকুর, তোমরা পুরুষ লোক, নানান্ জায়গায় বেড়াও। তারপর বইপত্তর পড়তি টড়তি পারো, তাই আলো দেখেছো। আমরা তো আঁধারে পড়ে রইচি। পচে গেছে এই জীবন।

—নিজেরে অতো ছোটো মনে করো কেন? ওই তোমাদের দোষ। দাঁতে নখ ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলাই বলে, জীবনকে বুঝতে গেলে বেশী লেখাপড়া লাগে না। মন দিয়ে বুঝলে, বোঝা যায়।

গোয়ালে গরু ডাকছে হাম্বা রবে। নতুন বাছুর হয়েছে বড়ো গাইটার। বক্না বাছুর। ছাগলগুলো চ্যাঁ ভ্যাঁ করছে। বলাইকে বসিয়ে রেখে রূপো গেল গোয়ালে। গরু বাছুর বার করতে করতে দাদু বেড়িয়ে ফিরবে। দাদুর সঙ্গে গল্প করুক বলাই ঠাকুর। সেই ফাঁকে বাসি কাজ সেরে কাপড় কেচে আসবে রূপো।

যা ভেবেছিল তাই। রূপো কাপড় কেচে এসে দেখে দাদু বেড়িয়ে ফিরে বলাইকে গল্প শোনাচ্ছে। আশ্চর্য মানুষ দাদু। একই গল্প দশজনকে শোনাতে পারে।

মোহন্ত বলছে পুরানো দিনের কথা! তখন ও সবে চাকুরীতে ঢুকেছে দত্তবাবুদের বাড়ি। তিনটে পালকি। বেহারা বারোজন। মোহন্তর বাবা তখন বেঁচে। সে ছিল বাবুদের পেয়ারের লোক। বাবার ছ্যাখতায় বছর কয়েক না যেতে মোহন্ত হলো বাবুদের খাস বেহারা। অর্থাৎ বেহারাদের খবরদারী করাই ছিল কাজ। অথচ বেহারাদের মধ্যে ওই ছিল সবার চেয়ে ছোটো। সামনে কেউ না বললেও অন্য সব বেহারারা নানা রকম হীন চক্রান্ত করতো বাবুদের কাছে মোহন্তকে খেলো করার জন্য। যদিও কেউ কিছু করতে পারে নি।

মোহন্তর তখন দাপট কি। আট-দশখানি গ্রামের কাহার সমাজে ওর নাম-ডাক। তখনো বিয়ে হয় নি মোহন্তর। কতোজন্

চায় মেয়ে দিয়ে মোহন্তকে জামাই করতে। শেষে অনেক দেখা দেখির পর বিয়ের ঠিক হলো ট্যাট্‌রার বদন কাহারের মেয়ে শৈলীর সঙ্গে। মেয়ের মতন মেয়ে শৈলী। যেমন রং তেমন চটক। বিয়ের পর মোহন্তর বাবা ছেলের বৌকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল দত্তবাবুদের বাড়ী। বাবুরা বৌ দেখে সুখ্যাতি করেছিলেন। আশীর্বাদী দিয়েছিলেন, সোনার নথ, নোলক, দামী শাড়ী, রূপোর মল! আরো কতো কি! শুধু রূপ নয়, শৈলীর গুণও ছিল যথেষ্ট। অমন না হলে কি বৌ। সংসারের সকল দিকে ছিল তার নজর। কুটো গাছটি ফাঁসিয়ে যাবার জো ছিল না। সাত-সাতটা গাই গরু ছিল, তাদের ধকল একাই সহ্য করতো শৈলী। খেয়ে দেয়ে দিন গেলে অন্ততঃ পাঁচসের দুধ বিক্রী করতো। বাবুরা নিতেন সে দুধ। শৈলী নিজে গিয়ে মাটির কেঁড়েয় করে দুধ পৌঁছে দিনে আসতো বাবুদের বাড়ী। শৈল যতো দিন ছিল, লক্ষ্মী বাঁধা ছিল ঘরে। শৈলী গেল, সেই সঙ্গে সব গেল। অলক্ষ্মীর কোপ পড়লো সংসারে।

শুধু শৈলীর কথা নয়। আরো কতো কাহিনী বলে যায় মোহন্ত। বলতে বলতে কখনো মোহন্তর দু'টি চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কখনো কখনো কান্নার আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। হাসি কান্না সুখ দুঃখে মেশানো ওর একশ' বছরের পুরাতন জীবন। যার সাক্ষী উঠোনের ওই তাল গাছটা।

গামছার খুঁটে চোখ মুছে মোহন্ত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে,-ভগবানের মার, দুনিয়ার বার। তোমার আমার হাত কি বলো ঠাকুর? চোখের সামনে কতো কি দ্যাখলাম, সে সব বল্‌তি গেলে মহাভারত।

এরপর দু'জনে খানিক সময়ের জন্যে চুপ চাপ। উঠোনের কোণে ঘাসের জায়গায় বাঁধা ছিল ধাড়ী গাইটা। হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে দে ছুট। মোহন্ত বলে ওঠে—হা দৈ ল্যা, ধাড়ী গাইডা দড়ি ছিঁড়েছে। অ রূপো—তুই যাবি, না আমি যাবো? ধরে না আনলে মাঠে গে পরের জমির ধান খেয়ে মেচ্‌মার করবে।

রূপো তাড়াতাড়ি বেরোয় ঘর থেকে।—হতভাগা গরু, জ্বালিয়ে

মারলে দেখতিচি। ফি দিন দড়ি কাটবে। দাঁড়াও, এবারে ছেকল কিনে আনাচ্ছি।

—তুই বোস, আমি যাচ্ছি রূপো।

—তা পান্তা খেয়ে যাও।

—এসে খাবানে। কত সময় আর লাগবে? বলে মোহন্ত জিউলী গাছের সবুজ পল্লব ভেঙে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

বলাই ঠাকুর বসে আছে। রূপো বলে, এবেলা গরীবের বাড়ী দুটো চাল ডাল ফুটিয়ে খেয়ে দেয়ে বিকেলে বাড়ী যেয়ো'খন।

—না রূপো, আমি এখনি যাবো।

—আমাদের বাড়ী ভাত খালি জাত যাবে না। নিজে যখন রান্না করে খাবা!

—জাত? জাতের বিচার আমি করিনে। মানুষের আবার জাত কি? তুমিও যা আমিও তাই।

সত্যি কি তাই! রূপো আর বলাই ঠাকুরের জাত কি এক? ঠাকুর যাই বলুক, রূপো ও কথা মানে না। বলে, তবে জাত নে এতো বাছ-বিচার কেন? তোমাদেব শাস্তরে তো লেখা আছে, বামুন-শুদ্যুর এক জাত নয়। আলাদা। তবে কি তা মিছে কথা?

—শাস্তর টাস্তর আমি পড়ি নি রূপো। তাতে কি লেখা আছে তাও বুঝিনে। নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতে যা বলে তাই বললাম। আমার কাছে সব মানুষের জাত এক। সকলের রক্তের রং তো লাল।

—সবাই তো তোমার মতো সাদা মনেব মানুষ নয় ঠাকুর।

বেলা বাড়ছে। মোহন্ত সেই গেছে গরু ধরতে এখনো ফেরে নি। এতো সময় বলাই বসে বসে রূপোর সঙ্গে কথা বলেছে, গল্প করেছে। আর নয়। এবারে বাড়ী যেতে হবে। কাক-ডাকা ভোরে নিমের দাঁতন চিবোতে চিবোতে বলাই বেরিয়েছে। আর এতো বেলা হয়ে গেছে। রূপো বার বার অনুরোধ করেছে এবেলা এখানে

রান্না খাওয়ার জন্যে। না। আজকের মতন 'না' বলেছ বলাই। বলেছে, 'আর একদিন এসে খেয়ে যাবো।'

তবে তাই। কিন্তু এতো বেলায় শুধু মুখে যাবে ঠাকুর! না পেরে এক চুপড়ি কাঁচা তরি তরকারী এনে দেয় রূপো।

বলাই বলে, এ.সব আবার কেন?

—তা হোক, নে যাও। বাড়ীব জিনিষ। কিনে তো দেই নি। বাবা ঠাকুরকে একদিন আসতে বোলো।

—আচ্ছা। একদিন যেও আমাদের বাড়ী। মাযের সঙ্গে কথা বলে এসো। যাবে তো?

—মেয়েলোক কি যাই বললেই কোথাও যাতি পারে ঠাকুর?

—একটু ইচ্ছে মাফিক চলতে ফিরতে শেখো। তোমরা তো মাটির পুতুল নও, যে এক ঠাঁই স্থির হয়ে থাকবে! তরকারীব চুপড়ি হাতে বলাই উঠে দাঁড়ায়, বলে যাই। আবাব আসবো। এ্যা?

—দাঁড়াও, পেরণাম করে নেই!

—না, না! ওই হয়েছে, বলে বাধা দিতে যায় বলাই। রূপো শোনে না। গলায় আঁচল দিয়ে পায়ের ধূলি নিয়ে প্রণাম করে বলাইকে।

বলাই ঠাকুর চলে গেছে। এবেলা আর ক্ষেতের কাজ কর্ম হলো না। সকাল সকাল রান্নাঘবে ঢুকেছে রূপো। ভাত ফুটছে। ফুটুক। হামাই ধানের সিদ্ধ চাল, বড্ড জ্বাল খায়।

পুঁই-ডাঁটা কুটছে রূপো। নিতাইদা বলে গেছে, কুচো চিংড়ি এনে দেবে। সেই ভরসায় কোটা। চিংড়ি মাছ না হলে পুঁই ডাঁটার তরকারী মজে না। দাদু রোজ বলে। আজ রাঁধি, কাল রাঁধি করে পুঁই ডাঁটা রান্না আর হয়ে ওঠে না। ভারি ফিচকুটি। আর দুটো মানুষের জন্যে এসব ভালোও লাগে না।

কিন্তু দাদু এখনো ফিরলো না কেন? রূপো দরজার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে দেখছে মাঝে মাঝে। হতভাগা গরুটা ভারী পাজী।

তার ওপর বাঁধা গরু ছাড়া পেলে যা হয়। লাফালাফি শুরু করে। দাদু একা পারবে তো সামলাতে! না, ও নিজে গেলেই ভালো করতো। বুড়োমানুষ, চোখেও ভালো দেখতে পায় না। কি যে করবে!

ভাত হয়ে এলো। পুঁইডাটা কোটাও শেষ। নিতাইদা এখনো চিংড়ি মাছ নিয়ে এলো না। ভুলে যায়নি তো।

ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রূপো বাইরে এলো। উনুনের জ্বাল তুলে রেখেছে। মিছেমিছি সাত তাড়াতাড়ি উনুন জ্বাললো। দূর ছাই।

কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে এদিকে। বাড়ীর সামনে সিধে সড়ক। অনেক দূর থেকে মানুষ দেখা যায়। বোধ হয় নিতাইদা! রাঙাচি[illegible] বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ায় রূপো। নিতাই নয় চন্দরদা আসছে ছুটতে ছুটতে।

—রূপো, শীগ্‌গির আয়! চন্দর হাঁপাচ্ছে ছুটে এসে। বলে, হাঁ করে দেখিতিছিস কি, আয় আমার সঙ্গে।

—কেন, কি হয়েছে, কোথায় যাবো! রূপো চোখে অন্ধকার দেখে। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

—তুই আয় দিকিনি। কি হয়েছে দেখবি আয়। তবু হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইছিস? দেখতিছিস নে, আমার কাপড়ে চোপড়ে রক্ত মাথামাথি! এই ছ্যাখ হাত দুটো—

—দাদু, দাদুর কিছু হয়েছে? রূপো কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। যেন পাথর। শুনেও শুনতে পাচ্ছে না, দেখেও দেখতে পাচ্ছে না কিছু। না পেরে চন্দর সজোরে চেপে ধরে রূপোর একটি হাত। বলে, আয় আমার সঙ্গে। নে ছোট্—

রূপো বারবার জিজ্ঞাসা করে চন্দরকে, কি হয়েছে দাদুর? তোমার কাপড়ে এতো রক্ত কেন?

চন্দর কোনো কথা বলে না। রূপোর হাত ধরে ছুটে চলে এ পাড়া থেকে ও পাড়ায়। একেবারে চন্দরের বাড়ীর উঠোনে।

চন্দরের উঠোনে মানুষের ভিড়। ভিড় ঠেলে রূপোকে ভিতরে নিয়ে যায় চন্দর। আঙুল উঁচিয়ে বলে—ওই ছাখ, চিনতে পারতিছিস!

—দাদু, দাদু, দাদু গো! বলে চীৎকার করে রূপো ঝাঁপিয়ে পড়ে উঠোনে মাটির ওপর শায়িত দাদুর বুকের ওপর।

—কাঁদ, কাঁদ, খুব করে কাঁদ। তোর চোখের জলে বান্ ডেকে যাক, বলে চন্দরও হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। মোহন্ত ঠাকুর্দা যে ওকে আপনার জনের মতো ভালবাসতো।

উঠোনের মাঝখানে মাটির ওপর শুয়ে আছে মোহন্ত কাহাব। প্রাণের স্পন্দন নেই ও দেহে। নিঃসাড়। রূপোর কান্নায় কেন, আকাশটা ভেঙে পড়লেও সাড়া জাগবে না ও দেহে।

কি কুক্ষণে দড়ি ছিঁড়েছিল গরুটা। দড়ি ছিঁড়ে গরুটা সোজা ছুটে আসে মাঠের দিকে। আলের ধারেই বিপিন মালোর জমি। কচি কচি নতুন রোয়া ধান। সবুজ। লোভ সামলাতে পারেনি গরুটা। সবুজ পাতার লোভ। ক'টা পাতাই বা খেয়েছিল গরুটা!

বিপিন মালোর দুই ছেলে ছিল পাশের জমিতে। দেখতে পেয়ে ছুটে আসে। ধরে, বেঁধে রাখে গরুটাকে।

মোহন্ত প্রথমে এ মাঠের দিকে আসেনি। গিয়েছিল বাগদী পাড়ার দিকে। গরুটা দড়ি ছিঁড়ে সচরাচর ওই দিকেই যায়। বাগদী পাড়ায় গরুর খোঁজ না পেয়ে আসে এদিকে। দেখে—আলের ধারে গরুটাকে আগে থেকে কেউ বেঁধে রেখেছে। ভালোই হয়েছে। গরুর দড়ি খুলতে গিয়েই হলো বিপদ। ছুটে এলো বিপিন মালোর দুই ছেলে। প্রথমে ধান গাছ খাওয়া নিয়ে দু'এক কথা। তারপর বচসা। শেষ পর্যন্ত এতোদূর গড়াবে, বুঝতে পারেনি চন্দর। কি করে বুঝবে! নয়তো চন্দর পাশের জমিতে নালগাছ তুলছিল। বিপিনের বড়ো ছেলে মাতনের হাতে ছিল গাছ-কাটা দা। সামনা ঘাস কাটছিল ওই দা দিয়ে। অস্ত্র

আস্ফালন করে চড়া গলায় কি যেন বলছিল মাতন। তাই দেখেই চন্দর ছুটে যায়। ওর পৌঁছনোর আগেই কাজ সারা হয়ে গেছে। গাছ-কাটা দা দিয়ে মোহন্তর ঘাড়ে কোপ মেরেছে মাতন। ভোঁতা দা—নয়তো মুণ্ডুটা এক কোপেই ধড় থেকে আলাদা হয়ে যেতো। মোহন্ত লুটিয়ে পড়েছে আলের পাশে কাদায়। আর মাতন তার ভাইকে নিয়ে ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

মোহন্ত তখনো বেঁচে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্চে। রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে কাদা মাটি। চোখ দু'টো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে মোহন্তর। সারা দেহটা এক-একবার কুঁকড়ে উঠছে। চন্দর দাঁড়িয়ে দেখেছে এই মর্মান্তিক দৃশ্য। অসহায়ের মতো।

মোহন্তর দু'টি চোখ কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। চন্দর জিজ্ঞাসা করলে—কিছু বলবা ঠাকুর্দা? কিছুই বলতে পারলো না মোহন্ত। বলবার শক্তি কোথায়? শুধু ঠোঁট দু'টি বার বার কেঁপে উঠলো। কিন্তু বুকটা তখনো ধুক ধুক করছিল। তখনো প্রাণ ছিল মোহন্তর দেহে।

চন্দর চীৎকার করে আলের ওপর দাঁড়িয়ে। নদীর পাড়ে মাছ ধরছিল বাগদীরা। ছুটে আসে চীৎকার শুনে। তারপর ওরা ধরা-ধরি করে মোহন্তর রক্তাক্ত দেহটা নিয়ে যায় চন্দরের বাড়ী। তুলসী তলায় মোহন্তকে শুইয়ে রেখে চন্দর যায় রূপোকে ডাকতে মোহন্তর বুকের প্রাণ-স্পন্দন ততোক্ষণে থেমে গেছে চিরদিনের মতো।

নিতাই গেছে থানায়। দারোগা পুলিশ না-আসা পর্যন্ত কিছুই করবার নেই। চন্দরের কান্না থেমেছে। এতো সময় অনেক লোকজন ছিল, একে একে তাদের অনেকেই চলে গেল। যাক্। চন্দর অনেক বোঝায় রূপোকে। কিন্তু রূপোর কান্না কিছুতেই থামে না। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। কেন ও দাদুকে গরু ধরতে পাঠালো! সকালের পান্তাও খাওয়া হয়নি দাদুর। দাদু যে

বড়ো শখ করে বলেছিল, চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁই-ডাঁটার চচ্চড়ি খাবে। সেই দাদু নেই। মালোরা খুন করেছে। একটা জীবনের চেয়ে দুটো ধানের পাতার দাম বেশী হলো তাদের কাছে!

থানা থেকে দারোগাবাবু এসেছেন দু'জন কনস্টেবল নিয়ে। চন্দর যেমন যেমন দেখেছে, সেই মতো এজাহার দেয় দারোগাবাবুর কাছে। বাগদী পাড়ায় যারা নদীর ধারে ছিল, তারাও যেটুকু জানে তাই বলেছে।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। লাশ নিয়ে যেতে হবে শহরে। ডাক্তারী পরীক্ষা হলে তবে সৎকারের ব্যবস্থা। রূপো জড়িয়ে ধরে দারোগাবাবুর দু'টি পা। বলে, দারোগাবাবু, আপনার পায়ে পড়ি, মড়া-কাটা-ঘরে নে গে দাদুরে আর কাটাকুটি করবেন না।

দারোগাবাবু কোনো কথা বলেন না। একটি মানুষের এই মর্মান্তিক মৃত্যু দেখে তাঁরও সজল হয়ে উঠেছে!

রূপো এবারে জিজ্ঞাসা করে, আমার দাদুরে যারা খুন করেছে তাদের ফাঁসী হবে তো দারোগাবাবু?

—শাস্তি হবে বৈকি মা। ওঠো, কেঁদো না। যা হবার তা তো হয়ে গেছে।

তবু কি থামে রূপোর কান্না। দাদু ছাড়া আর কে আছে তার! জ্ঞান হতে বাবা-মা কাউকে দেখেনি ও। দেখেছে শুধু দাদুকে। সেই দাদু আজ নেই!

মোহন্তর মরা দেহটা পালকি করে বয়ে নিয়ে গেল শহরে, পাড়ার কয়েকজন ছেলে। মোহন্তর বড়ো সাধের পালকি। রায়হাটের দত্তবাবুদের কাছ থেকে পাওয়া। যত্ন করে রেখেছিল।

চরমুকুন্দপুরের আদি-বাসিন্দাদের শেষ মানুষ, একশ' বছরের কথা যে জানে, সেই মোহন্ত কাহার মারা গেছে। পালকি বয়ে যার কাঁধের মাংসপেশী ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে গেছে, মৃত্যুর পর সেই চললো পালকি চেপে তিন মাইল দূরের শহরের লাশ-কাটা-ঘরে।

দিন গেল। রাতও প্রায় শেষ হয়ে এলো। পালকি করে মোহন্তর মরা দেহ নিয়ে যারা শহরে গিয়েছিল, তারাই মোহন্তকে নিয়ে ফিরে এলো চরমুকুন্দপুরে শেষ রাতের অন্ধকারে। রূপোও গিয়েছিল সঙ্গে। সে-ও ফিরে এসেছে, চোখের জল শুকিয়ে গেছে। তবুও মনের ভেতরটা হু হু করে উঠছে।

রূপো অবাক হয়ে গেছে সুজয়ের ব্যবহারে। শহরে পৌঁছে নিতাই গিয়েছিল হাটখোলায়, সুজয়কে খবর দিতে। এতো বড়ো দুঃসংবাদ শুনেও সুজয় আসেনি রূপোকে সান্ত্বনা দিতে। বরং নিতাইকে কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে। বলেছে, রূপোর দাদু খুন হয়েছে তা আমি কি করবো? হাটবারের বেচাকেনা ফেলে যেতে পারবো না।

নিতাই বুঝিয়ে বলেছে, রূপোর তুমি ছাড়া আর কে রইল সুজয়? তোমাকে দেখলি মেয়েটা শান্ত হোতো। না গেলে কেঁদে কেঁদে মরে যাবে।

সুজয় তবুও বলেছে, তুমি যাও নিতাই। বলো গে, আরো তো আপনার জন রয়েছে। সেদিন বাবার কথা বিশ্বাস করি নি, এখন বুঝতে পারছি, যা রটে তার কিছুটা সত্যি বটে।

নিতাই প্রতিবাদ করে বলেছে, যা শুনেছো সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। তুমিও তাই বিশ্বেস করলে?

সুজয় আরো কি সব বলেছিল, তা ভালো করে কানে নেয়নি নিতাই। রাগে গর গর করতে করতে সটান চলে এসেছিল লাশ কাটা-ঘরে। রূপো জিজ্ঞাসা করেছিল আকুল হয়ে, কই সে এলো না?

—সে আসবে না। তারে আর কোনো দিন তুমি ডেকো না। এরকম যে হবে আমি অনেকদিন আগে থেকেই জানতাম রূপো। নে ভুলে যা সুজয়ের কথা।

রূপো ভেবেই পায় না, হঠাৎ সুজয় এমন ধারা বদলে গেল কেন! তাছাড়া এমন কি হয়েছে তার, যে এরকম দুঃখের দিনেও একবার দেখা দিতে আসতে পারলো না। এমন দিনে অতি বড়ো

শত্রুও দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে যায়। এই তো ফণীকাকা, রসিক মেসো সবাই এসেছিল। শুধু সুজয় এলো না।

মোহন্তর মৃত্যুর খবর দিনের মধ্যেই আশপাশের গ্রামগুলোয় ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু লোকজন দেখতে গিয়েছিল মোহন্তকে—লাশ-কাটা-ঘরে।

রূপো বাড়ী পৌঁছে দেখে, ওর মেসো মাসী এসেছে। মাসীকে খবর পাঠিয়েছিল চন্দর। এ তল্লাটে আত্মীয় বলতে রূপোর ওই মেসো মাসীই আছে।

মাসীকে দেখে আরো একবার উচ্চ কণ্ঠে কেঁদে ওঠে রূপো। মাসী নিজের মেয়ের মতো দেখে রূপোকে। বুকে জড়িয়ে কতো রকমে বোঝাতে তবে কান্না থামে।

আর এসেছে বলাই ঠাকুর। এসেই গেছে উঠোনে নামানো পালকির কাছে। মোহন্তকে শেষ বারের মতো দেখতে। কাল সকালেই তো এসেছিল বলাই। ওকে শোনাতে কতো সুখ দুঃখের গল্প করেছিল মোহন্ত। এখনো রূপোর কাছে আসেনি বলাই। কি জানি তাকে দেখে যদি আবার মেয়েটি কেঁদে ওঠে! সব সহ্য করতে পারে বলাই। পারে না শুধু অপরের কান্না সহ্য করতে। লোকের চোখে জল দেখলে ওব চোখও ছল ছল করে ওঠে।

মাসীর বুকে মুখ গুঁজে রূপো আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—আমার কি হবে মাসী?

রূপোর মায়ের ছোটো বোন বাতাসী। ওর স্বামী গোলোক আর রূপোর বাবা সনাতন ছিল সমবয়সী বন্ধু। দুই বন্ধু বিয়ে করে ছিল দুই বোনকে। মোহন্ত বরাবরই নিজের ছেলের মতো দেখতো গোলোককে। বাবা মায়ের কাছে যেমন আব্দার করে, রূপো ছোটোবেলা থেকে মেসো মাসীর কাছে তেমন আব্দার করে এসেছে।

বাতাসী বলে, আজ থেকে না হয় আমার আর একটা মেয়ে বাড়লো। কাঁদিসনে রূপো। দাদু তো অকালে যায়নি।

—কিন্তু দাদু যে অপঘাতে মরলো! কোন পাপে এমন হলো মাসী!

—পাগলী মেয়ে, অমন কথা বলতি নেই। অমন করে বললে, তোর দাদু যে সগ্যে গে শান্তি পাবে না।

স্বর্গ! পৃথিবী থেকে স্বর্গ কত দূর। রূপোর দাদু যেখানে যাবে। জিজ্ঞাসা করে রূপো কচি মেয়ের মতো, সগ্য কোথায় মাসী, পিরথিবী থেকে কত দূর?

ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি তখনো। বাঁশের চালিতে করে মোহন্তকে নিয়ে এলো গ্রাম-প্রান্তে শ্মশানে।

বল হরি, হরিবোল। একশ' বছরের ইতিহাস মরে গেছে। শুধু ওই মরা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে একটি তাল গাছ। থাকবে অনেক দিন। আর রইলো দত্তবাবুদের নক্সা আঁকা পালকি।

রূপো নিজের হাতে আগুন দেয় দাদুর মুখে। গামছায় বেঁধে এনেছিল দাদুর না-খাওয়া পান্তা ভাত, আর কাঁচা পুঁই ডাঁটা। দিয়েছে চিতার ওপর। সকালে পান্তা না খেয়ে দাদু গিয়েছিল গরু ধরতে। বড়ো ইচ্ছে ছিল পুঁইডাঁটা চচ্চড়ি খাওয়ার। এ জন্মে তা আর হলো না।

চিতা জ্বলছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে চিতার আগুন। রূপো বসে আছে বাবলা গাছের নীচে, চিতার আগুনের দিকে চেয়ে। দেখছে কেমন করে দাদুর পুরোনো দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আশ্চর্য মানুষ এই বলাই ঠাকুর। শব-যাত্রার সঙ্গে এসেছে শ্মশানে। ব্রাহ্মণের ছেলে, তবু এতটুকু খুঁতখুঁতুনি নেই অন্য জাতের সম্পর্কে। মানুষের আবার জাত কি! সব মানুষের রক্তের রং লাল, গাঢ় লাল! জন্মের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন শুরু, মৃত্যুতে শেষ। ব্যতিক্রম নেই।

শ্মশান-যাত্রীরা চিতায় কলসী করে জল ঢেলে আরো কয়েকবার

হরিধ্বনি দিলে। তারপর দল বেঁধে ফিরে এলো গ্রামে। বলাই ঠাকুরও এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। দাঁড়িয়েছে রূপোর সামনে।

—ঠাকুর, রূপো জলভরা দু'টি চোখ তুলে বলে, আমার কি হবে?

—তোমার মাসী মেসো আছে, ওরা তো মা-বাবার মতো। কোনো চিন্তা নেই। আচ্ছা, আজ আমি চলি। আবার আসবো। বলে বলাই ঠাকুর চলে গেল সেদিনের মতো।

ফেরার হয়েছে মালো পাড়ার মাতন আর তার ছোটো ভাই ওদের বাবা বিপিনকে হাতে হাত-কড়া পরিয়ে নিয়ে গেছে পুলিশ। জামিন দেয় নি। মাতনই ছিল সুদামের ডান হাত। তাই মাতন চলে যেতে সুদামের দস্তুরমতো অসুবিধে হয়েছে। তাই সব ঘটনার পরেও সুদাম এখনো বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায়, রূপোকে বিয়ে করবেই। তা সে যেমন করে হোক।

লোক-পরম্পরায় সে কথা কানে এসেছে রূপোর। বলেছে, আসুক না ড্যাকরা, নাক কেটে ছেড়ে দেবো।

মোহন্তর মৃত্যুর পর গোলোক বার বার বলেছিল রূপোকে, চরমুকুন্দপুর ছেড়ে চরদিয়ায় যাবার জন্যে। সে কথা শোনেনি রূপো। বলেছে, দাদুর ভিটে ছেড়ে কোথাও যাবে না। গোলোক ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। এক কথা দশবার বলতে পারে না। তাছাড়া ওর ধারণা রূপোর এ-জিদ আজ আছে, কিন্তু কাল থাকবে না। সেদিন ও নিজেই বলবে মেসো, চলো এ-ভিটে ছেড়ে।

যাই হোক মুস্কিল হয়েছে গোলোকের। স্ত্রী বাতাসীকে সর্বক্ষণের জন্যে রেখেছে রূপোর কাছে। আর ও নিজে আসে সন্ধ্যের পর। আবার ভোর হতে চরদিয়ায় চলে যায়। দু'দিকে টানা-পোড়েন করা যারপরনাই অসুবিধে। ওদিকে ভাই, ভাই-বৌএর ভরসায় সংসার ফেলে আসতেও পারে না। এদিকে রূপোকেও ফেলবার জো নেই।

চরমুকুন্দপুরের মানুষগুলো যেন কি! রূপোর হয়ে গোলোক গেল শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে। নিমন্ত্রণ তো কেউ গ্রহণ করলো না, উল্টে অনর্থক দশ কথা শোনালো। তাই নিয়ম ভঙ্গের দিন শ্মশান যাত্রী ছাড়া আর কাউকে নিমন্ত্রণ করেনি গোলোক। দরকার নেই ঝামেলায়। গ্রামের লোক থাকুক তাদের সমাজ নিয়ে। এমনধারা অসার সমাজের তোয়াক্কা করে না গোলোক। রূপো তো আমলেই আনে না। বলে, সমাজ আবার কি! খেয়ে দেয়ে কাজ নেই শুধু ঘোঁট পাকানো।

শ্রাদ্ধ শান্তি নির্বিঘ্নে চুকে গেছে। নিজের ইচ্ছেয় গোলোক কিছু করেনি। রূপো যেমন বলেছিল তেমন করেছে।

শ্রাদ্ধের পর রূপো যেন অনেক সহজ হয়েছে। আগের মতো যখন তখন কাঁদতে বসে না। শুধু দাদুর কথা উঠলে ওর মুখটা থম থম করে ওঠে।

সেদিন সন্ধ্যের পর গোলোক ফিরেছে চরদিয়া থেকে। রূপো দাওয়ায় বসে হ্যারিকেনের আলোয় আ-বাছা চালের ধান বাচছে। বাতাসী রান্না করছে। গোলোক বসেছে দাওয়ায় এক কোণে।

এক সময় গোলোক নিজে থেকেই বলে, জানিস রূপো, শুধু তোর পেছনে লেগে এখানকার লোকের ভাত হজম হচ্ছে না। এবারে বলাই ঠাকুরের নামেও যা তা বলে বেড়াচ্ছে। বলাই ঠাকুর মানুষ না দেবতা। ওর পা-ধোয়া জল খালিও পুণ্যি হয়।

—বলো কি মেসো?

—হ্যাঁ রে হাঁ! তুই যারে ভালোবাসতিস, সে সুজয় ছোঁড়াও কম যায় না। শোনলাম, সেও নাকি তোর ওপর সন্দেহ করতেছে। সে দিনে শ্মশানেও গেল না, যদি তার মনে কু না থাকতো, তাহলি এর পরেও তো একদিন দেখা করতি আসতো! এ গাঁয়ে মানুষ নেই।

—আমি আর কারো কথা ভাবি নে মেসো! বলে রূপো দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে!

মুখে যাই বলুক, সুজয়ের কথা রূপো ভুলতে পারে না। সুজয় হয়তো ভুলে যাবে ওর কথা। কিন্তু রূপো কোনোদিন মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না সুজয়কে। ভুলবে বলে তো ও ভালবাসেনি সুজয়কে। ভালোবাসা তো মাটির পাত্তরের মতো ঠুনকো নয়, যে একটু আঘাতে ভেঙে যাবে।

রূপোর মনে পড়ে সেদিন সকালের কথা। সব কথা শোনার পরেও সুজয় এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে। বলেছিল কথায় কথায়, রূপোর মনের ব্যথা উপলব্ধি করে—'দিন এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' সে কি শুধু মুখের কথা? মনের কথা নয়?

দিন কয়েক পর। সকালবেলা। গোয়াল পরিষ্কার করে গাই দুয়ে উঠোনে গোবর জল ছিটিয়ে ঝাঁট দিয়ে রূপো বসেছে দাওয়ার কোণে। উন্মনা হয়ে কি যেন ভাবছে। আজকাল যখন তখন শুধু বসে বসে ভাবে।

বাতাসী বলে, কি ভাবিস অতো!

—কি আর ভাববো মাসী! ভাববার কিছু নেই।

—ইদিকে আয় দিকিনি, ওলটা কুটে দে।

—যাই।

নিতাই এলো এই সময়। আজ হাটবার। তাই এসেছে বোধ হয় বলতে।

রূপো জিজ্ঞাসা করে, হাটে যাবা তো নিতাই দা?

—যাবো বৈকি! তোমার কি কি আনাজপত্তর যাবে, ঠিক ঠিক করে রেখো। আজ একটু সকাল করে যাবো, তাই বলতি এ্যালাম। আজ আর পরের বাড়ীতে কাজে গ্যালাম না। বাড়ীর দিকে একটু টুকটাক কাজ পড়ে রয়েছে।

নিতাই আর দাঁড়ালো না। রূপো রান্নাঘরে ওল কুটতে বসে। বাতাসী বলে, পান্তা খাবিনে?

—না।

—না না করিস নে, আর পান্তা না খাস তো দুটো গরম-গরম ফ্যানে ভাত করে দেই, খা।

—ক্ষিধে হয় নি মাসি।

মোহন্তর মৃত্যুর পর থেকে পান্তা খাওয়া ত্যাগ করেছে রূপো। ওর দাদু যে মুখের পান্তা খেতে পায় নি। আহা, ক্ষিধে নিয়ে মারা গেছে দাদু।

দাদুর কথা মনে পড়লেই রূপোর চোখে জল ঝরে। এতো জল আছে ওই দু'টি চোখে। যেন অফুরন্ত।

রান্নার তরকারীপত্তর গোছ গাছ করে রূপো ঝুড়ি চুপড়ি নিয়ে বাগানে এলো। সকাল করে হাটে যাবে নিতাই। এবেলা সব গুছিয়ে না রাখলে নয়। শশা, চাল কুমড়ো, আর কচুরমুখিতেই ঝুড়ি বোঝাই হয়ে গেল। এখানো বাকী আছে বরবটি, পালং শাক তোলা। বরবটি তুলতেই ফিচকুটি। মাচার নীচে যেগুলো ঝুলে পড়েছে, সেগুলো তুলতে অসুবিধে নেই। কিন্তু মাচায় ওঠাই মুস্কিল। বাঁশগুলো বর্ষা খেয়ে আধ পচা হয়ে আছে, তবু মই দিয়ে আলতো ভাবে মাচায় ওঠে রূপো।

বরবটি খুঁটিয়ে তুলতেই বেলা হলো। সূর্য মাথার ওপর উঠেছে। এবেলা থাক এই পর্যন্ত। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদে।

স্নানাহার সেরে রূপো ছেঁড়া ন্যাকড়ার সলতে পাকাতে বসেছে। নয় তো প্রদীপ জ্বলবে না। বাতাসী পানের ডাবর নিয়ে বসেছে। ভাত খাবার পর গাল ভরা পান দোক্তা না হলে তার তৃপ্তি হয় না। আগে পানের নেশা যাও বা ছিল, কখনো দোক্তা মুখে দেয় নি রূপো। এখন দোক্তা না হলে রূপোর পান খেয়ে আশ মেটে না।

প্রথম প্রথম হেঁচকি উঠতো। পিচ ফেলতে হতো। আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে। দু'টিপের জায়গায় চার টিপ দোক্তা খায়। বাতাসী বলে, খাতি আরম্ভ করিচিস বলে, অতো খাসনে। অম্বলের ব্যারাম হবে।

রূপো বলে, কিছু হবে না মাসি। তুমি দাও দিকিনি আর একটু, বেশ লাগে।

সলতে পাকানো শেষ করে সবে চাটাই বিছিয়ে শুয়েছে রূপো, এমন সমন নিতাই এলো।—অ রূপো, ওই বড়ো ঝুড়িটা ছাড়া আর কিছু আছে নাকি ?

রূপো বাইরে আসে। বলে, আজ আর কিছু দেলাম না।

—বাঃ,বেশ গন্ধ ছেড়েছে তো দোক্তার! দ্যাও দিকিনি জুৎ করে এক খিলি পান। বলে নিতাই দু'হাত দিয়ে তরকারীর ঝুড়ি উঁচু করে দেখে কতোখানি ভার।

রূপো সযত্নে পান সেজে দেয় নিতাইকে। পান চিবোতে চিবোতে নিতাই জিজ্ঞাসা করে, হাট থেকে কিছু আনতি হবে নাকি ?

—আনতি হবে বৈকি। রূপো মনে মনে হিসেব করে বলে, পান-সুপুরি, মতিহারী তামাকের পাতা, নুন আর গোলমরিচ। আর কি যেন বলছিল মাসী, ও পাঁচফোড়ন চার পয়সার।

—দ্যাখো আর কিছু না তো ?

—না, আর তো কিছু মনে পড়ছে না।

গামছার আলটা মাথায় কায়দা করে বাঁধে নিতাই, বলে, দ্যাও ঝুড়িটা তুলে দ্যাও।

তরকারীর ঝুড়ি মাথায় নিয়ে নিতাই সবে বেড়া পেরিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে ডাক দেয় রূপো—ইলিশ মাছ পাও তো ছোট দেখে এনো। মেসো বড় ভালোবাসে—পেছনে ডাকলাম, একটু দাঁড়িয়ে যাও নিতাইদা।

—আর দাঁড়াতে হবে না, ওসব মেয়েলি শাস্তর আমি মানিনে— বলে নিতাই চলে গেল।

আগের চেয়ে অনেক সহজ এবং স্বাভাবিক হয়েছে রূপো। এখন আর যখন-তখন গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে না। বাগানে কাজ করে আগেকার মতো। শুধু কাজ আর কাজ। যদিও কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে দাদুর কথা মনে পড়ে।

বাতাসী এর মধ্যে কতোদিন কতোরকমে বুঝিয়েছে রূপোকে। বলেছে, চরমুকুন্দপুর ছেড়ে চরদিয়ায় গিয়ে থাকার জন্যে। সেখানে বাতাসীর ছেলেমেয়েরা আছে। দেওর-ভাজ, তাদের ছেলে-মেয়েরা রয়েছে। সেখানে ভালোই থাকবে রূপো। বাতাসীর নিজের মেয়ের মতো।

কিন্তু সেই এক কথা রূপোর। না। দাদুর ভিটে ছেড়ে কোথাও সে যাবে না। কতো রকমে বোঝাতে চেয়েছে বাতাসী। কাকে বোঝাবে। রূপোর মুখে সেই এক কথা!

বাতাসীর নিজের অসুবিধের কথাও জানিয়েছে। নিজের ছেলেমেয়েদের এক জায়গায় রেখে সে আর কতোদিন আর-এক জায়গায় থাকতে পারে। তারপর রূপোর মেসোর কথা। সে মানুষটা দিনে থাকে একঠাঁই, আবার রাতে একঠাঁই, দু'বারে চার মাইল পথ টানা-পোড়েন করতে হয়।

এতো অসুবিধে জেনেও রূপো বলছে যে, সে দাদুর ভিটে ছেড়ে কোথাও যাবে না। যদি একা থাকতে হয় তাও থাকবে।

তাই কদিন আর ওই প্রসঙ্গে কোনো কথা পাড়ে নি বাতাসী। জানে রূপো ভারি একগুঁয়ে প্রকৃতির, শেষটা হিতে বিপরীত হবে।

বোনঝি হলেও রূপোকে নিজের মেয়ের মতো মনে করে বাতাসী। আর রূপোও জ্ঞান হতে মাকে বাবাকে দেখেনি। মাসী মেসো ওর কাছে মা বাবার মতো।

মায়ের কথা মনে নেই রূপোর। কি করে মনে থাকবে। তিন বছর বয়সে ও মাকে হারিয়েছে। তাই যখন-তখন মাসীর মুখের দিকে চেয়ে দেখে ও। ভাবে, হয়তো ওই রকম দেখতে ছিল মাকে,

ওই রকম মুখ চোখ নাক সব কিছু। মাসী এতো ভালোবাসে, না জানি মা থাকলে আরো কতো ভালবাসতো। দাদুর কাছে শুনেছে মায়ের কথা। দাদু নিজে পছন্দ করে মাকে নিয়ে এসেছিল ঘরে। কাঁচা হলুদের মতো রং ছিল গায়ের। ছিল সুঠাম চেহারা। আরো কতো কথা বলেছে দাদু ওর মায়ের সম্পর্কে।

সেদিন বিকেল বেলা। রূপো ঘুমোচ্ছে। বাতাসী আমড়া গাছের ছায়ায় বসে পাটকাটিতে গোবর মাখিয়ে মশাল তৈরী করছে। কাঠ কিংবা ঘুঁটের চেয়ে এগুলো জ্বলে ভালো। জ্বালাতেও বেগ পেতে হয় না।

বাতাসী আপন মনে কাজ করছিল। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকায়। বলাই ঠাকুর!

মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে খিড়কীর পুকুর থেকে গোবব মাখা হাত ধুয়ে এলো বাতাসী। দাওয়ার চৌকির ওপর পেতে দিল কম্বলের আসন। তারপর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে চাপাস্বরে বললে,—বোসো ঠাকুর, বলে রূপোকে ডেকে দেয়।

ঘুম-ভাঙা চোখ রগড়াতে রগড়াতে রূপো এলো বাইরে। বসলো বলাই ঠাকুরের সামনে মাটির মেঝের ওপর।

বলাই বলে, বাবা পাঠালেন। দুটো সৌরে কলার তেড় দিতে হবে। বাবা কার কাছে শুনেছেন তোমাদের বাড়ীর কলার জাত নাকি খুব ভালো!

—হ্যাঁ। বলে ওদের বাড়ীর সবরে কলার প্রসঙ্গে জানালো এবারে রথের সময় এক কাঁদি পাকা সবরে কলা বসিরহাটের এক ফড়ের কাছে তেরো টাকায় বিক্রী করেছিল। তোলা পাঁক মাটি যদি কলা গাছের গোড়ায় দেওয়া যায়, তাহলে দেখবার মতো কলা জন্মায়।

—কিন্তু তেড় তুমি নে যাবা কেমন করে? রূপো বলে, দুটো তেড়ের ভার যা তা নয়।

—খুব পারবো।

—পারবা তো বোঝলাম। কিন্তু ঠাকুর, তুমি আমার বাড়ী থেকে কলার তেড় বয়ে নে যাবা, সেটা কি দেখতি ভালো?

—তাতে কি হয়েছে?

—হবে আবার কি! বামুন মানুষ। জেনে শুনে তোমার ঘাড়ে কি বোঝা চাপাতে পারি!

বলাই হেসে ওঠে রূপোর কথায়। বলে, কোন অন্যায় হবে না। দাও দিকি কোদালটা। আর কোন তেড়টা ভালো হবে বলে দাও।

—বোসো না ঠাকুর, এতো যাবার তাড়া কেন! তাছাড়া তোমারে আমি কলার তেড় দেবো না। আজ না হোক, কাল নিতাইদারে দে পাঠিয়ে দেবানে। তারপব তোমার খবর কি বলো?

—ওই একরকম চলছে। বলে বলাই উঠতে যায়। বাধা দেয় রূপো। বলে, তা বোসো থির হয়ে, দাদু থাকতি তো বসে বসে কতো সময় গল্প করতে।

দরজার আড়াল থেকে বাতাসীর অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ঘরে ডাব আছে, একটা কেটে দে ঠাকুর মশায়ের ছেলেরে। অ রূপো, শুনিচিস কি বললাম?

—শুনিচি, যাচ্ছি মাসী।

শুধু ডাব নয়, পাথর বাটিতে কচি শশা আর আখের গুড় দিয়েছে রূপো। গুড় মাখিয়ে শশার টুক্‌রো চিবোতে চিবোতে বলাই বলে, এক ঘটি জল দাও।

—আমাদের ছোঁয়া জল খাবা তো?

—কেন, জলেরও জাত আছে নাকি! বলাই হাসতে জানে, তাই সব কথাতেই প্রায় হাসে।—এসব আচার বিচার যে কবে উঠে যাবে।

সবে জলের গ্লাসে চুমুক দিয়েছে, এমন সময় রসিক এলো। রসিকের আসাটা নেহাৎ কাকতালীয়। রূপো তাড়াতাড়ি ঘরে

ঢোকে। এসেছে যখন তখন না বসতে দিলে ভালো দেখায় না। দাওয়ার ওপর তালপাতার চাটাই পেতে দেয় রূপো। তবে মুখে কিছু বলে না।

রসিক নিজে থেকে বলে ওঠে, না, না, বসবো না। কেডা বসে আছে তাই দেখতি এ্যালাম। তা কেমন আছো ছোট ঠাকুর? বাবা ঠাকুরকে যে দেখিনে অনেক দিন। তেনার শরীর আছে কেমন?

—ভালো। তবে বয়েস তো হয়ে যাচ্ছে। বলাই ডাবের মুখ কাটতে কাটতে বলে, দাড়িয়ে রইলে কেন?

—বসবো না। কাজ আছে। বাড়ীর এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে রসিক কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করে বলে, কি ছিল, কি হয়েছে এই বাড়ীর চেহারা। কালে আরে কতো কি হবে!

রসিক চলে গেলে রূপো স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। আগে যতোখানি শ্রদ্ধা ভক্তি করতো ঠিক ততোখানি ঘৃণা সঞ্চিত হয়েছে রসিকের ওপর। ওই লোকটি যতো গণ্ডগোলের কারণ। ওই তো মিথ্যে করে রটিয়ে বেড়ায় সে-রাতের ঘটনা।

বলাই বসে রইলো আরো কিছু সময়। কথার মধ্যে ও বার-বার দেখছিল রূপোকে।

রূপোর মূর্তি গড়তে আরম্ভ করেছে ও! হয়তো শেষ হতে অনেকদিন লাগবে। তা লাগুক। কিন্তু মূর্তি যেন একেবারে নিখুঁত হয়। রূপোর গালের ওপরের ওই মাঝারি আচিলটাও যেন বাদ না পড়ে।

মাঝে মাঝে রূপোও অবাক হয়ে দেখে বলাইকে! মানুষ নয়, দেবতা। নয়তো এতো হাসতে পারে একটি মানুষ! না।

কখনো দু'জনের চোখোচোখি হয়ে যায়। দৃষ্টি ফিরিয়ে মাথা নীচু করে রূপো। বলাই কিন্তু ঠিক তেমনি ভাবে চেয়ে থাকে!

আশ্চর্য।

এরপর দু'তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। এই কদিনে চরমুকুন্দপুরে অনেক ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে মাতন। পালিয়ে বেড়াচ্ছিল ডায়মণ্ড-হারবার অঞ্চলে। সেই খানেই ধরা পড়ে। ওর ছোটো ভাইটা নাকি মারা গেছে সাপের কামড়ে। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন। তবে শোনা কথা। মাতন নাকি পুলিশের কাছে বলেছে, মোহন্তকে খুন করেছে ওর ছোটো ভাই। ও গিয়েছিল ভাইকে সামলাতে। দোষটা মৃতের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার ফন্দিটা মন্দ নয়। বসিরহাটের জেল-হাজতে আছে মাতন। জামিন দেয়নি। বিপিনও এখনো হাজতে। একবার নয়, পর পর ক'দিন জামিন নামঞ্জুর হয়েছে।

বলাই ঠাকুর আসে রূপোর বাড়ী। তা নিয়েও কথা উঠেছে গ্রামে। গ্রামের কথা গ্রামের বাইরেও গেছে। নরুঠাকুরের কানেও তার কিছু কিছু পৌঁছেচে। নরুঠাকুর এসব কথার বিন্দু বিসর্গ বিশ্বাস করেননি। ছেলেকে তিনি ভালোরকমই জানেন। নিজের ছেলে বলে গর্ব করা নয়, সচরাচর অমনধারা ছেলে হয় না আজকালকার দিনে।

কিন্তু এসব কথা শোনা অবধি বলাই-এর মায়ের মন খারাপ। হাজার হোক মায়ের মন তো। ছেলের ওপর বিশ্বাস তাঁর অগাধ, কিন্তু যদি একঘেঁয়ে এক কথা রোজ কানে আসে তাহলে মন খারাপ হয় বৈকি। তাইতো একদিন ছেলেকে কাছে ডেকে একথা-ওকথার মধ্যে বলেন, লোকে যখন বলছে তখন তুই আর যাসনে চরমুকুন্দপুরে।

—কেন যাবো না মা, লোকে বলছে বলুক। তুমি তো বলছো না। বলাই সগর্বে জানায়, রূপোর মতো মেয়ে হয় না মা। কাহারের ঘরে জন্মেছে বলে ওর এতো হেনস্থা। একদিন আসতে বলেছি, এলে দেখো সে কেমন মেয়ে।

—আসতে বলেছিস। কবে আসবে?

—তা জানিনে, তবে একদিন না একদিন আসবে। রূপোর

কথা আমি প্রায়ই মনে ভাবি। ভাবি, এমন মেয়ের ভাগ্যে এতো দুঃখ কেন? রসিকের ছেলে সুজয়রে তুমি তো চেনো, বাবার কাছে পড়তে আসতো—মনে নেই?

—হাঁ হাঁ, মনে পড়েছে। সেই যে মুখের গড়ন যার লম্বা ছাঁচের, সেই তো?

—হাঁ, সেই ছেলে। বলাই অসঙ্কোচে বলে গেল সুজয় আর রূপোর প্রেম কাহিনী। যতটুকু জানে সবই শোনালো মাকে।

বোধ হয় মায়ের মনও ভিজে ওঠে রূপোর দুঃখের কথা শুনে। গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মনের ভাব ব্যক্ত করেন, তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না।

বলাই বলে, রূপোর বল ভরসা ছিল সুজয়। ভেবেছিল, যে যাই করুক, সে কোনোদিন ওকে দূরে ঠেলবে না। কিন্তু সেও শেষ পর্যন্ত বিগড়ে গেল। যার মুখ চেয়ে রূপো সব দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ্য করতে পারতো।

—ঠাকুর, বলাই ঠাকুর বাড়ী আছো নাকি?

এ কণ্ঠস্বর বলাই-এর পরিচিত। গোলোক এসেছে—রূপোর মেসো।

—এসো, বোসো গোলোকদা। তারপর এতো সকালে কি দরকার? পূজো আচ্চা আছে নাকি!

—না গো না। পূজো আচ্চার ব্যাপার নয় ঠাকুর। গোলোক ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে ওর প্রয়োজনের কথা বলে। গতকাল দিনরাতের মধ্যে জল স্পর্শ করেনি রূপো। মাসী মেসো অনেক সাধাসাধি করেছে। কিন্তু এমন একগুঁয়ে মেয়ে, যে, কোনো কথাই শুনলো না। সকালেও আসবার সময় তার হাত ধরে সাধাসাধি করেছে। তবুও মেয়ের উপোস ভাঙেনি।

কারণ এমন কিছু নয়। রূপোর মাসী কথায় কথায় বলেছিল ওকে, চরমুকুন্দপুরের বাস তুলে চরদিয়ায় আসার জন্যে। এর

আগেও অনেকবার বলেছে। বরাবরই 'না' বলে এসেছে রূপো। অন্যায় জিদ। দাদুর ভিটে ছেড়ে কোথাও যাবে না সে। বলে, কেউ না থাকে ও একা থাকবে।

রূপো বলছে বলেই তো তাকে একা রেখে ওর মাসী কিংবা মেসো চলে আসতে পারে না। এদিকে ঘর বাড়ী ছেড়ে ওরাই বা কতক্ষণ পারবে রূপোর বাড়ীতে থাকতে। এই সব কথা বলেছিল বলে মাসীর ওপর রাগ করে রূপো গতকাল ভাত জল স্পর্শ করেনি। ওর মাসীও না খেয়ে আছে।

—কিন্তু আমি কি করবো। বলাই নিস্পৃহ ভংগীতে বলে, তোমরা তার নিকট আত্মীয়, আমি তো বাইরের একজন ছাড়া কেউ নেই।

—তাহোক, তবু ও তোমার কথা শুনবে।

—কিন্তু আমি গেলে উল্টে যদি তার অভিমান বেড়ে যায়?

বলাই-এর মা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া ঘটনা শুনেছেন। তাইতো ছেলের কথায় বাইরে এসে বলেন, যা না, তুই গেলে যদি মেয়েটা খায়, যা। তারপর গোলোককে উদ্দেশ্য করে বলেন, আহা, মেয়েটা জনম দুখিনী। ছোটো বেলায় মা বাবাকে হারিয়েছে। এক দাদু ছিল, তাকেও হারালো। তোমরা বাপু কিছু বোলো না ও মেয়েকে। দু'দিন বাদে ও নিজেই বুঝবে তোমাদের অসুবিধে।

বলাই ঠাকুরকে নিয়ে গোলোক যখন চরমুকুন্দপুর পৌঁছলো তখনো বাতাসী সাধাসাধি করছে রূপোর হাত ধরে।

—তোর জন্যে কি আমরা মরবো শুকিয়ে? বাতাসী বলছে, আয় খাবি আয়। লক্ষীটি।

—না, আমার জন্যে তোমরা মরবা কেন! রূপোর মুখে সেই এক কথা।

—তুই না খালি কি আমাদের গলা দে ভাত নামবে? বাতাসী

সুর নরম করে বলছে, তোর মা থাকলি কি এমন রাগ করতি পারতিস ? তুই তো অবুঝ নোস্।

বলাই বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিল মাসী-বোনঝির কথাবার্তা। রূপো বসে আছে তক্তপোষের পায়া ঠেস দিয়ে। মেঝের ওপর চুপড়ি দিয়ে ঢাকা দু'টি থালা। নিশ্চয়ই কাল সকাল থেকে ওদের খাবার ঢাকা রয়েছে।

রূপো মাথা নীচু করে বসে আছে। চোখ মুখ বসে গেছে একদিন নিরম্বু উপবাসে। সহ্য করতে পারবে কেন উপোসের কষ্ট ? তারপর উপোসের সঙ্গে রয়েছে মানসিক দুশ্চিন্তা।

এতোক্ষণে বলাই সাড়া দেয়, ও কি হচ্ছে রূপো ! ওমা, তুমি এমন ছেলে মানুষ ! এখনো ভাতের উপর রাগ ! আমি তো রাগ হলে ভাত বেশী করে খাই।

অপ্রত্যাশিত ভাবে বলাই ঠাকুরকে দেখতে পেয়ে রূপো বিস্মিত হয়। লজ্জাও পায়। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না।

বলাই এবারে হাসি মিশিয়ে বলে, যাকে বেশী ভালোবাসা যায়, তার ওপর বেশী রাগ দেখাতে হয়, এটাই নিয়ম। মাসীর ওপর তাই অমন রাগ দেখানো হচ্ছে ?

—মেসো বুঝি তোমারে ডেকে এনেচে ?

—না, না, আমি ডেকে আনবো কেন ! বলাই কিছু বলবার আগেই গোলোক বলে ওঠে, ঠাকুর আসছিল, রাস্তায় দেখা—তাই আবার এ্যালাম।

—বুঝি, আমি সব বুঝতে পারি। বলে রূপো আঁচলে মুখ ঢাকে। চোখের জল বোধহয় আর সামলাতে পারছে না।

আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদছে রূপো। কি সব বলছে ফোঁপাতে ফোঁপাতে, বোঝা যাচ্ছে না একটি কথাও।

—এই ছ্যাখো আবার কাঁদতে আরম্ভ করেছে, গোলোক সস্নেহে বলে, আঃ কাঁদিসনে রূপো। তুই কাঁদ, তোর মাসীও কাঁদুক। আর কি—

হঠাৎ উতলা হয়ে ওঠে রূপো। —দ্যাও, ভাত দ্যাও, জন্মের শোধ খেয়ে নেই। উঃ, একদিন খাইনি, তার জন্য এতো!

—বেশী পাকা পাকা কথা বলিস নে, ভালো লাগে না। আয় রান্নাঘরে আয়—গরম ফ্যানে ভাত রেঁধেছি, খাবি আয়। ওই বাসি কড় কড়ে ভাত খাতি হবে না। বলে রূপোকে হাত ধরে রান্নাঘরে নিয়ে গেল বাতাসী।

এবেলা আর বাড়ী ফেরা হলো না বলাই-এর। রূপো পায়ে ধরে সেধেছে। কখনো এমন করে না সে। না বলতে পারেনি বলাই।

কিন্তু রান্না করে খাওয়া বলাই-এর পক্ষে একরকম ঝকমারি ব্যাপার। কখনো করে নি। কোন যজমান বাড়ী রান্না খাওয়ার হাঙ্গামা ও পছন্দ করে না। যদিও আজকের ব্যাপার আলাদা।

বলাই বলেছিল রূপোকে রান্না করতে। রাজী হয় নি রূপো। ওর মাসী-পার মেসো তো বলাই-এর কথা শুনে অবাক হয়েছিল। বাতাসী বলেছিল, শুদ্দুরের ছোঁয়া জল খাতি নেই, আর ভাতের কথা কি করে বলতি পারলে ঠাকুর?

—খাবো তো আমি, জাত যায় আমার যাবে।

—আর পাপের ভাগী হই আমরা, বলে বাতাসী আর কোনো কথা কয়নি। বলাইও অনর্থক বাক্য ব্যয় করেনি রান্না-খাওয়া নিয়ে।

অগত্যা জ্বলন্ত উনুনের সামনে বসতে হলো বলাইকে। উনুনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বাতাসী। রান্নার গোছগাছ করে দিয়েছে রূপো। চাল ডাল দিয়েছে পাঁচজনের মতো। অতো কি হবে বলতে রূপো বলেছে, আজ আর বাড়ীতে আলদা রান্না হবে না। ঠাকুরের প্রসাদ পাবে সবাই। ভাত ডাল আর আলু কুমড়োর তরকারী হবে। গোলোক গেছে বাগদী পাড়ায়, যদি মাছ পাওয়া যায়। বদরতলার বাঁধে শার্শে, ভেট্‌কি ধরা পড়ছে। যখন-তখন না হোক, সকালে অধিকাংশ সময় পাওয়া যায়।

জ্যান্ত পার্শে মাছ নিয়ে এসেছে গোলোক। এদিকে রান্না তখন প্রায় শেষ, শুধু ভাতটা নামাতে যা বাকী। মাছ কুটতে বসলো বাতাসী। মসলা বার করে দিয়েছে রূপো। বাটনা বেটে নিতে হবে বলাইকে।

রান্না শেষ হতেই বেলা দুপুর, তারপর নাওয়া-খাওয়া। খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকলো অনেক বেলায়। নতুন মাদুর ছিল, তাই পেতে দিয়েছে রূপো, বলাই ঠাকুর শোবে। কিন্তু বিশ্রামের অবসর নেই বলাই-এর। সুপুরি চিবোতে চিবোতে বলে, এখনি আমাকে যেতে হবে রূপো।

—কেন, একটু জিরিয়ে গেলে কি হবে?

—হবে না কিছু। মাকে আমার জানো না তো, না বলে কোথাও যাবার উপায় নেই। এই এসেছি তোমার এখানে, গিয়ে দেখবো মা হয়ত ভাত কোলে নিয়ে বসে আছেন। আমি যাই—

আবার নতুন করে রূপোর মুখের দিকে তাকায় বলাই। অনেক দিনের চেনা-জানা রূপো। তবু যেন পুরোনো হয় না। যেন কী এক বিস্ময় লুকিয়ে আছে ওই রূপোর মধ্যে। যার জন্যে তাকে দেখতে ইচ্ছে করে দিনের পর দিন।

রূপোর মূর্তি গড়া শুরু করেছে বলাই। সবে শুরু। শেষ কতদিনে হবে কে জানে, তাই তো শিল্পীর চোখে রূপোকে দেখা। নয়তো সৃষ্টি সার্থক হবে না। রূপো যতোখানি সুন্দর, ঠিক ততো-খানি সুন্দর হবে মাটির মূর্তি।

—এতো কি ছাখো ঠাকুর?

—দেখি তোমারে। আচ্ছা, আজ আমি যাই, আবার একদিন শীগগির আসবো, বলে বলাই চলে গেল।

রূপো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো পৈঠের ওপর। না জানি ওর মধ্যে কি দেখেছে বলাই ঠাকুর, যার জন্যে সে অমন আকুল চোখে তাকিয়ে থাকে। গুণী মানুষ ওই বলাইঠাকুর, ওর মনের খবর কেমন করে জানবে রূপো।

ফিরতি পথে ডাকাতমারীর খালের মুখে বলাই-এর দেখা হলো সুজয়ের সঙ্গে। সাইকেল চেপে সুজয় আসছিল। থামতো না, যদি না বলাই ওকে ডাকতো।—এদিকে কোথায় গিয়েছিলে সুজয় ?

—তোমাদের গ্রামে। ক'টা টাকা পাব একজনের কাছে তাই আদায় করতে গিয়েছিলাম।

—তা আদায় হলো ?

ধার দিলে অতো সহজে আদায় হয়! সুজয় জিজ্ঞাসা করে, তা তুমি এই অবেলায় কোত্থেকে ?

—আর বলো কেন ? বলে রূপোর প্রসঙ্গ খুলে বলে। শুনে সুজয় বাঁকা হাসি হেসে শ্লেষাত্মক কণ্ঠে বলে, তা তুমি না হলে মানিনীর মান ভাঙাবে কে ? বেশ, বেশ।

যতোই সহজ-সরল মনের মানুষ হোক না কেন বলাই, সুজয়ের কথার ভঙ্গীতে ও বুঝতে পারে কি বলতে চায় সে। তবুও সে সহজ সুরে বলে, কি যে রসিকতা করো, বুঝিনে।

—তা বুঝবে কেন! সুজয় অকারণ সাইকেলের ঘণ্টা বাজায়। বলে, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না। যা রটে, তার কিছুটা ঘটে বটে।

বলাই অবাক হয়ে যায়। এই সেই সুজয় যে ছিল ওর ছোট বেলাকার বন্ধু। বাবার কাছে পড়তে আসতো সুজয়। ছেলেকেও যেমন যত্ন করতেন নরু ঠাকুর, তেমনি সুজয়কে। চরমুকুন্দপুরে পাঠশালা খুললেন বলাই-এর বাবা। বলাই যেতো বাবার সঙ্গে। সুজয়ও আসতো। তারপর শহরের স্কুলে—সেখানেও ওরা এক-সঙ্গে পড়েছে। গরীব কাহারের ছেলে বলে সবাই ঘৃণা করতো সুজয়কে। কিন্তু বলাই রোজই বসতো সুজয়কে পাশে নিয়ে। এ নিয়ে ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরা বলাইকে কোণ-ঠাসা করে

রেখেছিল। আজ সেই সুজয় কিনা ওব ওপর মিথ্যা সন্দেহ করে এরকম অশোভন আচরণ কবতে পারছে! আশ্চর্য!

তবু মনে সন্দেহ বলাই-এব। হয়তো বন্ধু হিসেবে ঠাট্টা করছে সুজয়। বলে, ছাখো সুজয়, বাবা তোমাদের পুরুত, কিন্তু তোমার বিয়েতে আমিই মন্ত্র পড়াবো।

—আমাব বিয়ে মানে?

—বোকা, কিছু বোঝো না, না? রূপো যে তোমাবে—

বলাই-এব কথা শেষ হ.লো না। রূপোব নাম শুনেই সুজয় খিঁচিয়ে ওঠে, ও ছুঁড়ির নাম কবো না। বলে, কদর্য ভাষায় সুজয বলতে আরম্ভ কবে রূপোর প্রসঙ্গ। সুদামকে নিয়ে যা যা ঘটেছে, তা থেকে আবম্ভ করে এটা ওটা আরও কতো রকম কথা। শেষে বলাইকেও টেনে আনে।

ঠাণ্ডা রক্ত বলাই-এর। অন্য কেউ হলে এভাবে জঘন্য কথার কামড় নীরবে সহ্য করতো না। আর বলাই এসব শোনার পরেও কিনা সুজয়কে বোঝাতে চায়!

—যাও, মিছে ফ্যাচোর ফ্যাচোর কোরো না। সুজয় সাইকেলের সিটে চাপড় মেড়ে বলে, তুমিও কম যাও না। বলি মজেছো তাই বলো।

—এ সব কথা তোমায় কে বললে বলতে পারো সুজয়? আমি জানতাম তুমি বুদ্ধিমান, পরের মুখে ঝাল খাবে না। নিজে কিছু জানো? কিছু দেখেছো চোখে?

—আমার বাবা, ফণীকাকা এঁরা মিথ্যে বলেন নি। আমি দেখিনি, বাবা দেখেছেন। প্রথমটা শুনে বিশ্বাস করি নি, কিন্তু পরে আরো সব ঘটনা ঘটেছে—

—কি ঘটেছে? বলে বলাই দাঁড়ায় সুজয়ের সাইকেল ধরে। তোমায় বলতে হবে সব কথা। না শুনে ছাড়বো না।

—সে সব নোংরা কথা শোনাতে আমি সময় নষ্ট করতে পারবো না, বলে সাইকেলে চেপে বসে সুজয়।

-দাঁড়াও, বলে যাও।

কিন্তু আর কোনো কথাই বললো না সুজয়। চলে গেল রূপো সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করে।

চীৎকার করে ডাকলো বলাই, ডাক শুনে একবার ফিরেও তাকায়নি সুজয়।

খালের ধারে মাছ ধরার সুবিধের জন্যে ইজাবাদের লোক ছোটো কুঁড়ে তৈরী করেছে। পাশেই বাঁশের তৈরী মাচা। ব্যাপারী ট্যাপারী এলে এখানেই বসে, বাড়ী না গিয়ে বলাই এসে বসলো বাঁশের মাচায়। লোকজন নেই। এ সময় কেউ থাকে না।

বলাই মনমরা হয়ে বসে আছে। চিন্তা-ভাবনা নিজের জন্য নয়। রূপোর দুঃখের চিন্তায় ও বিভোর। কি দারুণ মিথ্যে সুজয়ের কথা। শুধু সুজয় কেন, সারা গ্রামের মানুষেরা এই মিথ্যে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। লাভ কি! শুধু শুধু মিথ্যে হয়ে যাবে একটি মেয়ের জীবন।

কিন্তু কেন? কেন গ্রামের মানুষ একযোগে ছোবল মারতে আরম্ভ করেছে একটি মেয়ের ওপর! মানুষ এতো নীচে নামতে পারে, এ ধারণা আগে কোনোদিন ছিল না বলাই-এর। বরাবরই ও মানুষকে দেখতে চেয়েছে অন্য চোখে। মানুষ হবে মানুষের মতো। হয়তো সকলের জীবনের মাপকাটি একরকম না হতে পারে, তাই বলে এমন হবে কেন! এতো নীচ, এতো সঙ্কীর্ণ, এতো অনুদার! মানুষকে কোনদিন এমন ছোট করে ভাবতে পারেনি বলাই। এখনো ভাবতে পারছে না।

বলাই জানে না, কখন বিকেল হয়েছে। কখন সূর্য অস্ত গেছে। শেষ কার্তিকের সন্ধ্যা, অল্প অল্প হিম পড়তে আরম্ভ হয়েছে এখন থেকে।

বলাই-এর খেয়াল হলো এতোক্ষণে। সেই কখন এসে বসেছে, এখনো বসে আছে। মা বাবা হয়তো ভাবছেন। না, আর নয়।

সেই কোন সকালে রূপোর মেসোর সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, আর এখন সন্ধ্যে উতরে গেছে।

আজকাল রোজই খাবার জল আনতে রূপো যায় মনসাতলায় টিউব-ওয়েলে। গোটা কাহারপাড়ার মধ্যে ওই একটি টিউব-ওয়েল। উত্তরপাড়া দক্ষিণপাড়ার সকলকেই খাবার জলের জন্যে আসতে হয় এই কলে।

দাদুর মৃত্যুর পর ক'দিন বাতাসী যেতো জল আনতে। আজকাল আবার রূপো যাচ্ছে। সকাল বিকেল সন্ধ্যেয় ভিড় থাকে কল-তলায়। রূপো তাই যায় ভরা দুপুরে, যখন কেউ বড়ো থাকে না কলতলায়। পাড়ার মেয়ে কি বৌ-ঝিরা ওকে দেখলেই টিপ্পনী কাটে। নোংরা ভাষায় মন্তব্যও করে কেউ কেউ। তাইতো সকাল বিকেলে কলতলায় দূরের কথা, বাড়ীর সীমানার বাইরে যায় না। পাড়ার মধ্যে অতি বড়ো অসতী যে নন্দমিস্ত্রীর বোন সৈরভী, সেও কি না বলতে ছাড়ে না রূপোকে। অথচ এই সৈরভীর গুণের কথা জানে না এ তল্লাটে এমন কেউ নেই। কিন্তু কোনাদিন কারো কথার প্রতিবাদ করেনি রূপো। লোকে বলছে বলুক।

আজ দুপুরে জল আনতে ভুলে গিয়েছিল রূপো। বিকেলেও মনে হয়নি জল আনার কথা। সন্ধ্যের সময় মাসী জল খেতে গিয়ে দেখে কলসী শূন্য। মাসীই যেতে চেয়েছিল জল আনতে, কিন্তু রূপো যেতে দেয়নি।

মাটির কলসী কাঁখে নিয়ে রূপো জল নিতে এলো মনসাতলার কলে। কে একজন চাতালে বসে গা ধুচ্ছিল। দূর থেকে চিনতে পারেনি। এসে দেখলো—টগর।

অনেক দিন পরে টগরের সাথে দেখা হলো রূপোর। আগেকার দিন হলে এতো সময় কত কথা উথলে উঠতো দু'জনের মুখে। আজ দেখা হওয়ায় বিস্ময়টাই বেশী। কথা নেই কারো মুখে।

রূপো ভাবে, কতো ভাব ছিল ওদের। ওদের ভাব-ভালোবাসা

দেখে অন্যের চোখ টাটাতো। আজ সে সব উবে গেছে মিথ্যে ঘটনার ঝড়ে। হয়তো টগর আজ ওকে ঘৃণা করে। ভালোবাসে না।

কিন্তু আজ টগরই প্রথম কথা বলে, কেমন আছিস সই? কদ্দিন পর দেখা হলো। পিঠের ময়লা গামছা দে ঘসে দে না।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই রূপোর মুখে কথা ফোটে, তোর পিঠের ময়লা পোস্কার কি করে করি বল্! আমার সব্যাঙ্গে যে ময়লা।

—ইস, অমন তেল কুচকুচে দেহে কোনদিন ময়লা জমে নাকি? টগর মনের বেদনা জানিয়ে বলে, আমার ওপর রাগ করিসনে সই। হাতে পায়ে শেকল বাঁধা, ছুটে যে তোর কাছে যাবো তার উপায় নেই।

—আর আমার পথে যে কাঁটা দেছে। আমিই বা তোর কাছে যাই কি করে বল! তোর আসাটা আমার যাবার চেয়ে অনেক সহজ। তাছাড়া দাদু নেই, দাদুর সঙ্গে সঙ্গে আমার সব চলে গেছে। কি নিয়ে যে বেঁচে থাকবো তাই ভাবি। রূপোর কণ্ঠস্বর সিক্ত হয়ে ওঠে। চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, ভাবতাম, একদিন না একদিন তুই আসবি। কিন্তু এলিনে।

—বলে আর লজ্জা দিসনে, আমি চোখের জল ফেলেচি, আর ভেবেচি। কি দুঃখে আমার দিন কাটতেছে তা যদি জানতিস! তোর হয়ে কথা বলি বলে বাবা মা কি কম কথা শোনায় আমায়? আগে দাদা ছিল আমার দিকে, এখন দেখি সেও উল্টে গেছে।

—ওসব কথা ছেড়ে দে সই। আমি আর কারো কথা ভাবিনে। কপালে যা আছে তাই হবে; কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

সন্ধ্যে উতরে গেছে। তবু যেন এদের কথা শেষ হয় না। কতোদিন পরে দেখা হয়েছে দু'জনে। এতোদিন ধরে পরস্পরের মনের কোণে একটু একটু করে জমা হয়েছে ব্যথা-বেদনা, মান আর অভিমান। এর মধ্যে কতো ঘটনার ঝড় বয়ে গেছে রূপোর জীবনের ওপর দিয়ে। অন্য মেয়ে হলে হয়তো সহ্য করতে

পারতো না সে ঝড়ের বেগ। রূপো বলেই পেরেছে। আর টগর, নীরবে চোখের জল ফেলেছে প্রিয় সখি রূপোর দুঃখে। কখনো কখনো মুখর হয়ে উঠেছে। সুজয়কে সে কতো রকমে বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু সুজয় বোঝে নি। মিথ্যে রটনাকে সত্যি বলে মেনে নিয়েছে। টগরকে তিরস্কার করে বলেছে, তোর আর ওকালতী করতে হবে না ওই রূপো ছুঁড়ির হয়ে। আর ওর সঙ্গে তুই মেলা-মেশা করিস তো তোরে বার করে দেবো বাড়ী থেকে। রূপোর গুণের কথা জানতে বাকী নেই। সব কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু বলাই ঠাকুরের সঙ্গে অতো পিরিত কিসের বলতে পারিস?

—দাদা তুমি ওই ভালো মানুষটার নামে যা তা বোলো না। বলাই ঠাকুরের মতো মানুষ ক'টা আছে?

—ভালোমানুষ না ভিজে বেড়াল!

না পেরে টগর জিজ্ঞাসা করেছে, তবে রূপোকে তুমি ভালো-বাসতে কেন? সে যে তোমারে স্বামী বলে জানতো।

—আমি না তোর বড়ো ভাই! সুজয় ভারিক্কি চালে বলেছে, আমার সঙ্গে ওসব কথা বলতে তোর মুখে আটকায় না?

—সত্যি কথা বলতি আমার মুখে আটকায় না। এরপরই টগর নরম সুরে অনুনয় জানিয়েছে, দাদা, তুমি পরের মুখের কথা শুনে রূপোরে ভুল বুঝো না। রূপো সত্যি তোমারে ভালোবাসে, তার ভালোবাসায় খাদ মেশানো নেই।

—ফের ওই সব কথা। সুজয় রুখে উঠতে টগর অনন্যোপায় হয়ে শুধু বলেছে, আর বলবো না, তবে পরে তুমি বোঝবা। তখন আর লাভ হবে না বুঝে। পাখী খাঁচা ছেড়ে পালালে আর ধরা যায় না।

টগর আরো কতো কথা শোনায় রূপোকে। রূপো সকরুণ হেসে বলে, কেন মিছে আমার জন্যে তোর দাদার সঙ্গে ঝগড়া করলি সই? আমার কপাল ভেঙেচে তাই এতো কাণ্ড। যা, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বাড়ী যা। আমিও যাই। পারিস তো একদিন দুপুরে আসিস।

—না টগর গভীর বেদনার সঙ্গে বলে, কোন মুখে তোর বাড়ী যাবো সই? যদি কোনো দিন হাসি মুখে যেতে পারিতো যাবো, নয়তো নয়।

জলভরা মাটির কলসী কাঁখে নিয়ে ঘরে ফিরছে রূপো। সন্ধ্যা উত্‌রে গেছে অনেকক্ষণ। গা-ঘোর অন্ধকার। গা ছম-ছম করছে ওর। তবু ভয়ে ভয়ে পথ হাঁটতে হয়। ভরা কলসীর জল চলকে পড়ছে। শব্দ হচ্চে ছলাৎ ছলাৎ। কোমরের কাপড় ভিজে যাচ্চে চলকে পড়া জলে। ভিজুক। তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কি জানি, হয়তো কোথায় ওৎ পেতে আছে সেই মালো পাড়ার সুদাম!

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। বন-তুলসীর ঝোপ উঠলো নড়ে। অন্ধকারের মধ্যে পথ রোধ করে দাঁড়ায় কে একজন্ পুরুষ মানুষ।

—আজ আর ছাড়ছি না।

গলার আওয়াজেই লোকটিকে চিনতে পারে রূপো। সুদাম। যেন হিংস্র জানোয়ারের মুখে পড়েছে। ভয়ে ভয়ে রূপো বলে ওঠে, সরো, বাড়ী যাবো।

—যাবা বৈকি! সুদাম দাঁতে দাঁত ঘসে বলে, সেদিন ঝাঁতি ছুঁড়ে মেরেছিলে, আজ কি করবা?

—কেন তুমি আমার সব্যনাশ করতে চাও? কি করেচি তোমার? আর্ত কণ্ঠে রূপো বলে, পথ ছেড়ে দাও। বাড়ী যাবো—কই সরো।

—আহা, রূপোর গা ঘেঁসে দাঁড়ায় সুদাম। ভরা কলসীটি কাঁধ থেকে নামাও। হালকা হয়ে দু'দণ্ড বসে গল্প করি। সুজয় তোমারে বে করবে না, তার জন্যি নিশ্চিন্ত থাকো। শেষটা কোন বুড়ো হাবড়ার ঘরে গে পড়বা, তার চেয়ে আমায় মালা দ্যাও—আমি তো তোমার পরানের সুজয় কি বলাই ঠাকুরের চেয়ে খারাপ নই—আমি তোমারে—

কাঁধের উপর হাত রেখেছে সুদাম। রূপোর সর্বাঙ্গটা শির শির করে ওঠে। একদিকে ভয় অন্য দিকে ঘৃণা। হঠাৎ রূপোর মনে ফন্দি জাগে। আগু পিছু চিন্তা করবার সময় কই! যা হয় হোক। জলভরা মাটির কলসীটা ছুঁড়ে দেয় সুদামের বুকে। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করে।

উঠানের মাঝখানে শুকনো কাঠ পড়েছিল। অন্ধকারে টের পায়নি, হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় শুকনো মাটিতে। মাসী মাসী—বলে তারস্বরে চীৎকার করে চেতনা হারায় রূপো।

কেরোসিনের কুপী নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে বাতাসী। অচেতন রূপো, দাঁতে দাঁত লেগে পড়ে আছে মাটির ওপর। পরণের কাপড় আলু থালু। জল আনতে গিয়েছিল, অথচ মাটির কলসীটা কাছে-পিঠে পড়ে নেই দেখে বাতাসী আড়ষ্ট হয়ে যায়। কি করবে ভেবে পায় না। বার বার রূপোর নাম ধরে ডাকে। সাড়া নেই।

খানিক বাদেই বাতাসীর হকচকানি কাটে। অচেতন রূপোকে আড়কোলা করে তুলে আনে ঘরে। জল বাতাস দিতে ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ মেলে চায় রূপো। একবার মুহূর্তের জন্যে মাসীকে দেখেই আবার চোখ বন্ধ করে। এখনো ঘোর কাটেনি। আপন মনে বিড় বিড় করে বলে, মাসী, সেই ছিনে জোঁকটা, মালোপাড়ার সেই ছিনে জোঁক, আমার গায়ের ওপর—

—কি বলছিস রূপো!

—সেই লোকটা, আমার কাঁধে হাত দিইছিল। আমার কি হবে মাসী?

—এখন কথা বলিসনে। পরে শুনবো। চুপ করে শুয়ে থাক।

আজ বেশী রাত করে ফিরেছে গোলোক। রূপো তখনো অকাতরে ঘুমোচ্ছে। এখনি হয়তো ঘুম ভাঙবে না। ঘুমোক। মুর্ছা গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই।

বাতাসী যেটুকু শুনেছে রূপোর মুখে সেটুকু স্বামীকে শোনায়। বলে, এ মেয়েকে নিয়ে এখানে আর থাকা চলে না। কোনদিন মরবে। কাল সকালে যা হোক একটা বিহিত করো।

গোলোক বলে, সকাল হোক, তারপর যা হোক করা যাবে। তবে ওই মালো ছোঁড়াকে আমি দেখে নেব। চরমুকুন্দপুরে কাহার পাড়ায় মানুষ না থাকতি পারে, তবে আমি চরদিয়ার ভদ্রেশ্বর কাহারের ছেলে। ছেড়ে কথা কবো না।

ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ গোলোক। আজ তার চোখ দুটো উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে।

মূর্তি গড়ছে বলাই। রূপোর মূর্তি। মনের পটে আঁকা রূপো। তারই মূর্তি গড়ছে গোপনে। কেউ জানে না। দিনে রাতে যখনই মন চায় কামরার দরজা জানালা বন্ধ করে অসমাপ্ত মূর্তিকে সম্পূর্ণ করতে বসে। কতোদিনে যে সম্পূর্ণ হবে তার ঠিক নেই।

যখনই বাড়ীর বাইরে যায় তখনই কামরার দরজায় তালা বন্ধ করে রাখে। পাছে কেউ দেখে ফেলে।

একদিন মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভাল ভাল মাটি চটকে কামরায় নিয়ে যাস কেন?

—একটা মস্তবড় পুতুল গড়ছি মা।

—ঠাকুর গড়ছিস তাই বল!

—না মা, ঠাকুর নয়। চোখে দেখেছি, ভালো লেগেছে, এমন একজনের মূর্তি গড়ছি। শেষ হয়ে যাক, তখন দেখো। তার আগে দেখতে চেয়ো না।

মা আর দ্বিতীয়বার ওই পুতুল গড়া নিয়ে একটি কথাও বলেন না। ছেলেকে তিনি ভালো রকমই জানেন। পুতুল গড়ার নেশা ওর ছোটবেলা থেকে। কিন্তু মূর্তি গড়তে ওর যতো শখ, ভাঙতেও তেমনি পাগল। আজ পর্যন্ত কতো মূর্তি গড়েছে, কিন্তু সবই ভেঙেছে। নিজের

সৃষ্টিকে নিজের হাতে কেউ নষ্ট করতে চায়? বলাই তা পারে। দিনের পর দিন যত্নের সঙ্গে যে মূর্তি ও গড়ে, মুহূর্তের খেয়ালে তা ভেঙে চুরমার করে ফেলে। কেউ কিছু বললে বলে, আমি গড়েছি, আমি ভাঙছি।

রূপোর মূর্তি গড়া এখনো শেষ হয় নি। কতো দিনে শেষ হবে, কে জানে। সব হয়েছে, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত করে গড়েছে। শাড়ী পড়ার ধাঁচটিও একটু উনিশ-বিশ হয়নি। কিন্তু চোখ দু'টি মনের মতো হলেও রূপোর মতো হচ্ছে না।

একদিন যদি কাছে থাকতো রূপো, তা হলে এমন হতো না। একদিন পুরো নয়, কয়েক ঘণ্টা যদি কাছে থাকতো রূপো! কতবার বলেছে, কিন্তু আজো আসার সময় হোলো না তার। তাইতো ও নিজে বার বার যায় রূপোর কাছে। চেয়ে থাকে তার দু'টি চোখের দিকে! কিন্তু বাড়ী এলেই বলাই-এর মন থেকে হারিয়ে যায় রূপোর দু'টি চোখ! কিছুতে মনে করতে পারে না, কেমন দেখে এসেছে সে। দেখে এসেছে ঠিক, মনেও পড়েছে, কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যায়।

কদিন পর আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বলাই এসেছে নিজের কামরায়। বসেছে অসমাপ্ত মূর্তির সামনে। দুপুরে গিয়েছিল রূপোর বাড়ীতে। দেখে এসেছে তার দু'টি চোখ! কী সুন্দর চোখ। টানা টানা। চপলা হরিণীর মতো নয়। শান্ত সে দৃষ্টি। দূর আকাশের নক্ষত্রের মতো।

কেরোসিনের কুপী জ্বলছে। যতো না আলো দিচ্ছে, ধোঁয়া ওড়াচ্ছে তার বেশী। মূর্তির সামনে স্থির হয়ে বসে আছে বলাই। এতো ভেবেও ঠিক-ঠিক মনে করতে পারছে না রূপোর সে টানা চোখের গড়ন।

বোধহয় তেল ছিল না। কুপীটা নিভে গেল একসময়। আর কী হবে অন্ধকারের মধ্যে চুপ চাপ বসে থেকে! শুয়ে পড়ে বিছানায়।

ঘুম আসছে না। দেহে মনে অবসাদের ছোঁয়া। কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অবস্থা।

রূপোকে মনে পড়ছে। মিষ্টি মেয়ে রূপো। আরো মিষ্টি তার মুখের হাসি, চোখের চাউনি। অনুরণন জাগে বলাইয়ের শিরায় উপশিরায়। দেহের স্নায়ুগুলো যেন রূপোর চিন্তায় শিথিল হয়ে পড়ে।

যে জিজ্ঞাসা কোনদিন বলাই-এর মনে জাগে নি, আজ রাতের অন্ধকারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেই অব্যক্ত জিজ্ঞাসা! রূপোকে কি ও ভালোবাসে?

এতো চিন্তার মধ্যেও ঘুম আসে। জানে না কখন ঘুমিয়েছিল। প্রয়োজন ছিল না জানবার। শুধু ঘুম ভাঙতে শুনলো মা ডাকছেন।

খোলা জানালা দিয়ে ঢুকেছে রূপালী রোদ্দুর। ইস্, অনেক বেলা হয়ে গেছে। মা দাঁড়িয়েছিলেন দরজার কাছে। দরজা খুলেই বলাই মায়ের মুখ দেখে খুশী মনে বলে ওঠে, আজ আমার খুব ভালো দিন মা। উঠেই তোমাকে দেখলাম।

মায়ের দৃষ্টি পড়েছে কামরার কোণে। যেখানে রূপোর অসমাপ্ত মূর্তি। মুগ্ধ হয়ে মা বলেন, বাঃ, খাসা গড়েছিস তো। ও কোন পিরতিমে!

বলাই মুখে কিছু বলে না। মনে মনে বলে, ও কোন প্রতিমা নয় মা, রক্ত মাংসে গড়া একটি মেয়ের মূর্তি।

—কই বললি নে, ও কোন পিরতিমে?

—আগে শেষ হোক। তারপর শুনো, বলেই বলাই মুখ টিপে হাসে। কারণ ক'দিন আগেই সে মাকে বলেছে—চোখে দেখে ভালো লেগেছে এমন কারো মূর্তি গড়েছে। সে কথা ভুলে গেছেন মা। ভালোই হয়েছে। নয়তো বলাই আজ কিছুতেই গোপন করতে পারতো না। পারতো না মিথ্যে কথা বলে মাকে ভুল বোঝাতে। মিথ্যে বলতে মন চায় না বলাই-এর। সচরাচর বলেও না।

—ঠিক যেন লক্ষ্মী পিরতিমে! মুগ্ধ কণ্ঠে মা বলেন, এখনো চোখটা হয়নি রে, না? রং দিবি কবে?

বলাই আবার হাসে। লক্ষ্মী প্রতিমাই বটে। ওই প্রতিমার সত্যি পরিচয় পেলে মা হয়তো চমকে উঠবেন। মোহন্ত কাহারের নাতনী রূপোর মূর্তি গড়ছে শুনলে, নিশ্চয় খুশী হতে পারবেন না। হয়তো বলবেন, কি সর্বনাশের কথা! কাহারের মেয়ের মূর্তি গড়ছে তাঁর ছেলে! হয়তো তিরস্কার করবেন তাঁর আদরের ছেলেকে!

দুপুরে। বাবার সঙ্গে খেতে বসেছে বলাই। মা পাশে বসে। স্বামী-পুত্রের খাবার সময় রোজই পাশে বসে থাকেন।

এক সময় নরু ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, কালীপূজো করতে পারবি বলাই? ভ্যাবলার রাজবংশীরা বারোয়ারী পূজো করছে। তুই যদি পুঁথি ধরতে পারিস তাহলে আর কাউকে ডাকি নে। পারবি তো? এখন থেকে একটু আধটু সঙ্গে পিঠে থাকলে পাওনার কড়ি আর বাইরে যায় না।

—কখনো পড়িনি এই যা! বলাই বলে, নয়তো না পারার কি আছে! তবে পুঁথিটা এক-আধ দিন দেখে নিতে হবে।

—পূজো আচ্চা তোর ভাল লাগে না, তা আমি জানি। কিন্তু কি করবি বল। যদি ম্যাট্রিকটাও পাশ করতিস, তা হলে যা হোক হোতো। ওটুকু বিদ্যেয় তো চাক্‌রি-বাক্‌রি কিছু হবে না। তার চেয়ে পূজো আচ্চা শেখ, আর শিষ্য-সেবকদের দেখাশুনো কর। যা হোক করে চলে যাবে।

খেতে বসে অনেক কথাই বলেন নরু ঠাকুর। বলাই নীরবে শুনে যায়। বাবা মায়ের মুখের ওপর কোনদিন ও কথা বলে না। বাবা মাও জানেন, ছেলে তাঁদের নিপাট ভালোমানুষ। তাইতো তাঁদের খুশীর অন্ত নেই।

সুযোগ বুঝেছেন মা। নয়তো ঠিক এই সময় এ কথা পাড়বেন

কেন! বললেন, এবার আর তোর কোন কথা শুনবো না খোকা! যশাইকাটির আশু চক্কোত্তির মেয়েরে বৌ করে ঘরে আনবো। চক্কোত্তি ঠাকুর খুব ধরেছে। তারপর শুনিচি, মেয়েটারে দেখতে শুনতে ভালো। একদিন না হয় দেখে আয়। যাবি?

বলাইয়ের মুখে কোন কথা নেই। শুধু একবার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে খাওয়া দাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে।

—এখনো একেবারে ছেলে মানুষ, এই কথা বলতে মায়ের মুখে গর্বের হাসি ফোটে।

যে কথা দুপুরে বাবার সামনে বলতে পারেনি, সে কথা বিকেলে মাকে জানায় বলাই। বিয়ে সে করবে না। কোনো দিন করবে না, এমন কথা নয়। তবে আপাতত বিয়ে না করার ইচ্ছে। মাকে বোঝায়, যে দিনকাল পড়ছে তাতে বিয়ে করা মানে, নিজের জীবনের সঙ্গে আর একটি জীবন নষ্ট করা।

ছেলের কথা শুনে মায়ের মন খারাপ হয়ে যায়। একটু আগেই ভাবছিলেন, দু'চার দিনের মধ্যে দিনক্ষণ দেখে যশাইকাটির চক্কোত্তি মশায়ের মেয়েকে দেখতে যাবেন। কিন্তু ছেলের কথা শুনে নিরাশ হলেন। যদিও ছেলেকে বলেন, তোর কোন কথা আমি শুনবো না। বিয়ে তোকে করতে হবে। অঘ্রাণে না হোক, আসছে মাঘ ফাগুনে। বিয়ে করলে যদি জীবন বয়ে যেতো, তা হলে এতো ঘটা করে কেউ বিয়ে করতো না। তোরা আজ-কালকার ছেলে, বেশী বুঝিস তো!

বলাই বলে, আমার কথা শোনো মা। বিয়ে যে কোনোদিন করবো না তা নয়, তবে দু'এক বছরের মধ্যে নয়।

মায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। যে ছেলে কোনোদিন বাবা মায়ের কোনো ইচ্ছেয় বাধা দেয়নি, সেই ছেলের মুখে আজ এই কথা! বলাই জানে, এ ক্ষেত্রে বেশী কথা বাড়ানো ঠিক হবে না। একটুতে যে রকম গম্ভীর হয়েছেন মা, তাতে বেশী কথা বললে হয়তো যা না হবার তাই হবে। অগত্যা বলাই কাজের ছুতো দেখিয়ে চলে যায়।

ঐদিন সন্ধ্যায় বলাই এলো চরমুকুন্দপুরে। সবেমাত্র তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে ঘরে গেছে রূপো। মাসী নেই, ওবেলা মেসোর সঙ্গে বাড়ী গেছে। বলেছিল সন্ধ্যের আগে ফিরবে, কিন্তু এখনো ফেরেনি। বিকেল অব্দি নিতাই ছিল। সে চলে যেতে রূপো একা।

বলাইকে এ সময়ে কাছে পেয়ে রূপো স্বস্তি বোধ করে। ভালোই হয়েছে। একা একা এ বাড়ীতে গা ছম্‌ছম্‌ করে। সবচেয়ে ভয় সুদামকে। তিন তিনবার রূপোর হাতে তার হেনস্তা হয়েছে। নিশ্চয়ই সে চেষ্টায় আছে প্রতিশোধ নেবার।

—বাইরে কেন, ঘরে এসে বোসো ঠাকুর।

—না না, বাইরেই ভালো। বলে দাওয়ার ওপর জলচৌকিতে বসে পড়লো বলাই।

—সন্ধ্যের পর ঠাণ্ডা পড়ে, ঘরে বসলে পারতে, দরজার চৌ-কাঠের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রূপো। বলে, আলো দেবো?

—না।

বলাই কেন এসেছে, তা ও নিজেই জানে না। এসেছে এই পর্যন্ত। আজ বলে নয়, রূপো যেন ওকে বেঁধে ফেলেছে। কখন, কোন সময় তা ও জানে না; শুধু এইটুকু উপলব্ধি করে মনে, রূপো বাসা বেঁধেছে ওর মনের গোপনে।

কিন্তু রূপো কি সে খবর রাখে? বোধ হয় না। রূপো জানে, বলাই ঠাকুর খেয়ালী মানুষ। পুতুল গড়ে, গান গায়। ও আসে যায় মনের খেয়ালে। তবুও রূপোর মনের কোণে কোথায় যেন একটু দুর্বলতা। বলাই ঠাকুর এলে যেন একটু খুশী হয়।

—রূপো।

—কিছু বলবে?

—না।

—তুমি যেন কেমনধারা মানুষ, আদি অন্ত পাই নে।

—আমার আদিও নেই, অন্তও নেই। বলাই মৃদু হাসির ঝঙ্কার তুলে বলে, যেমন দেখছো আমি এই রকমই। এর বেশী কিছু খুঁজতে চেয়ো না আমার মধ্যে।

—তাই তো তোমারে আজো চিনতি পারলাম না, তুমি কেমন মানুষ!

রূপো এখনো দাঁড়িয়ে দরজার চৌকাঠ জড়িয়ে। যেন লজ্জাবতী লতা। চেয়ে চেয়ে দেখে বলাই! ঘরে জ্বলছে মাটির প্রদীপ। তার ফিকে আলোয় স্পষ্ট করে দেখা যায় না রূপোকে। অস্পষ্ট বলেই যেন ভালো লাগছে!

কি রং-এর শাড়ী পরেছে রূপো! বোধহয় রংটা ঘোর লাল। হাঁ, লালই বটে। রক্তের মতো লাল। পায়ে আলতা পরেছে ঘটা করে! হয়তো রোজই পরে। কপালে কাঁচপোকার টিপ কি আজো পরেছে!

—ওখানে কেন, কাছে এসো রূপো! বলাই-এর কণ্ঠস্বর যেন ভাঙা-ভাঙা।

রূপো কাছে এলো। বলাই-এর পায়ের কাছে প্রায়! বলাই বলে, আমি তোমার মূর্তি গড়ছি রূপো। প্রায় শেষ হয়ে এলো। শুধু চোখ দু'টি বাকী।

রূপো কথা বলে না। শুধু চাপা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

বলাই-এর কথাও শেষ হয়ে গেছে। শুধু বসে থাকা। সন্ধ্যার বিষণ্ণ মুহূর্তে আবছা অন্ধকারের মধ্যে বসে ওরা দু'জন। বলাই আর রূপো।

রূপোর জীবনপাত্র শূন্য। শুধু হতাশা, দীর্ঘশ্বাস আর অতৃপ্ত মনের বেদনা। কিন্তু আজ সন্ধ্যালগ্নের এই মুহূর্তে বলাই ঠাকুরের নিকট-সান্নিধ্যে বসে রূপোর মন যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। যে নদী ছিল মরা, সেখানে আজ হঠাৎ ভরা জোয়ার এলো কেমন করে! কালো মেঘ আড়াল করে রেখেছিল আকাশের চাঁদকে, সে মেঘ উড়ে গেল, আবার আলোয় ভরে গেল আকাশ! এতো আলো ছিল মেঘের আড়ালে?

—রূপো, বলাই অনুচ্চ কণ্ঠে কতকটা স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে বলে, মানুষের জীবনটা পেঁজা তুলোর মতো হালকা, না?

এই সহজ কথার অর্থ বোঝে না রূপো। জীবনটা পেঁজা তুলোর মতো হালকা, কিংবা পাথরের মতো ভার, এ দার্শনিক তথ্য ওর জানা নেই। কোনোদিন এমন জীবন-জিজ্ঞাসা ওর মনে উদয় হয় নি। সহজ সরল মেয়ে, গ্রামের মেয়ে—না জানে লেখাপড়া, না কোনো কিছু। কতটুকু ওর জীবনের গণ্ডী? তবু ও বোঝে, ওর জীবন বোশেখের কাঠফাটা রোদে শুকনো মাঠের মতো খাঁ খাঁ করছিল, প্রথম বর্ষায় আবার সে মাঠে সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠেছে!

অন্ধকার। গাঢ় নয় ফিকে। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। বাইরে আকাশে জ্বলছে অসংখ্য নক্ষত্র। তুলসী-মঞ্চে প্রদীপ জ্বলছিল। নিভে গেছে।

দূরে, বোধহয় এ গ্রামে নয়, গ্রামান্তরে ঢাক ঢোলের সঙ্গে সানাই বাজছে। মাঝে মাঝে বাজায় নলকুঁড়োর দাসপাড়ার বাজনদারেরা। এখান থেকে শোনা যায়।

ওরা দু'জন কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। শুধু নীরবে বসে থাকা। যদিও এই নীরবতার মধ্যেই আছে অনেক না-বলা কথার আভাস।

—অ রূপো, রূপো! গোলোকের ডাকে শুধু রূপোর নয় বলাইও সচকিত হয়ে ওঠে। বাতাসী আর গোলোক এসেছে। রূপো ডাক শুনেই উঠে দাঁড়ায়।

—আলো জ্বালিস নি এখনো? বলতে বলতে গোলোক এগিয়ে আসে, ওখানে আর কেডা! উত্তর দেয় বলাই নিজে,—আমি বলাই!

বলাই! নরু ঠাকুরের ছেলে! গোলোক সরল প্রাণের মানুষ। সহজ কথার বাঁকা মানে করতে জানে না। ভাবে, বলাই হয়তো এসেছিল কোনো না কোনো কাজে। তারপর রূপো ওকে আটকে রেখেছে। একা থাকতে হয়তো ভয় করছিল রূপোর।

কিন্তু বাতাসীর মনে খটকা জাগে! উঠোনের মাঝখানে পৌঁছে দেখেছে, ওরা দু'জন গা ঘেঁসে বসে আছে। সাড়া পেয়ে রূপো উঠে দাঁড়িয়েছে। সত্যি, হয়তো একা থাকতে ভয় করতো রূপোর, কিন্তু তাই বলে অন্ধকারের মধ্যে অমন নেকটা-নেকটি বসে কি করছিল ওরা? গল্প! তাহলে তো কথা শোনা যেতো! তাছাড়া ওদের সাড়া পেয়ে রূপোরই আগে কথা বলা উচিত ছিল।

এতোক্ষণে রূপো বলে, ঠাকুর ছিল বলে রক্ষে, না হলে যে একা একা কি করতাম মাসী! সন্ধ্যের আগে আসবে বলে গেলে, আর আর এই এলে?

সে কথায় কথা না-বলে বাতাসী বলে, আলো জ্বাল্।

—কেন, আলো তো জ্বলতেছে।

—ও পোড়া কপাল, কখন আলো নিভে গেছে তাও জানো না?

সত্যি, নিভে গেছে ঘরের আলো। কখন নিভেছে জানে না রূপো।

বলাই বলে, আমি যাই!

গোলোক জিজ্ঞাসা করে, অন্ধকারে যাতি পারবা? না পারো তো একটা আলো নে যাও।

—দরকার নেই। অন্ধকারে যাতায়াত করা আমার অভ্যেস আছে।

উঠোনে নেমে বলাই একবার পেছন ফিরে চায়। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে রূপো।

বলাই চলে গেছে। ঘরে তক্তপোষে প্রদীপের আলোয় লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ছে গোলোক। বাতাসী রান্না ঘরে। রান্না করছে। লঙ্কা-সরষে বাটছে রূপো। বাতাসীর মুখ ভার, রূপো বুঝতে পারে না কেন মাসী আজ অন্যদিনের মতো হাসছে না, কথা বলছে না। জিজ্ঞাসা করতেও পারে না। হয়তো মাসীর মুখ আরো গম্ভীর হয়ে উঠবে।

এক সময় বাতাসী নিজেই নিজের মনে বলে ওঠে, এ ভাবে টানা-পোড়েন করতি পারবো না। নিজের ঘর দোর রইলো পড়ে, আর মরতিছি পরের ঘরে হাড় হেঁসেল গুতিয়ে। এ কি ছাই পারা যায়?

মাসীর এ বিরক্তি প্রকাশের অর্থ রূপো বোঝে না এমন নয়। আর সত্যিই তো মাসীর দারুণ অসুবিধে হচ্ছে। তার নিজের ছেলে মেয়ে, দেওর-ভাজ রইলো এক জায়গায়, আর সে কি না বোনঝির বাড়ী এসে বসে রইলো!

এবারে বাতাসী সোজাসুজি রূপোকে বলে, আর অমত করিসনে রূপো। এভাবে কি বেশী দিন চলে?

রূপোর সেই এক কথা। দাদুর ভিটে ত্যাগ করে কোথাও যাবে না সে। বাতাসী জিজ্ঞেস করে, বে হলে কি করবি?

রূপো কথা বলে না। শুধু শিলের ওপরে সজোরে নোড়া ঘসেই জানায় তার কথা। বাতাসীর বিরক্তি ক্রমে বাড়ে বই কমে না। বলে, থাক, অতো জোরের সঙ্গে বাটনা বাটতি হবে না। রাগ দেখাচ্ছিস কারে? তুই ভাবছিস রাগ দেখালে মাসী চুপ করে যাবে। বলি, সন্ধ্যে বেলা বলাই ঠাকুর এইছিল কি করতি?

এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না রূপো। মাসীর জিজ্ঞাসায় ও থতমত খেয়ে যায়। উত্তর দেয় না। শুধু একবার ফিরে তাকায় মাসীর গম্ভীর মুখের দিকে। বোঝে, এই কথা বলবার জন্যেই মাসীর এতো কথা বলা।

—কি বলবি বল। ভাতের ফ্যান গালতে গালতে মাসী বলে, লোকে নানান্ কথা বলবে না কেন! লোকের মুখে কি কুলুপ আটা যায়! সন্ধ্যে বেলা, সোমত্ত মেয়ে তুই, কি ভিজির ভিজির করছিলি ঠাকুরের সঙ্গে? যদি একটা আলো জেলে বসতিস তাও কথা ছিল।

—মাসী—আর্তনাদের মতো শোনায় রূপোর কণ্ঠস্বর। তুমি কি ভেবেছো মাসী?

—ভাববো আবার কি? এতোজনে এতো কথা বলতেছে, তবু

তোর চোখ খুললো না। বাতাসী সুর নরম করে বুঝিয়ে বলে, কোনো কিছুর বাড়াবাড়ি ভালো না। সে দিন আমার কথায় রাগ করে ভাত খেলিনে। আমি বললাম, তোর মেসো বললে, কারো কথা শুনলিনে। শেষটা তোর মান ভাঙালো বলাই ঠাকুর। আমাদের মান কোথায় গেল বলতো!

দুঃখে অভিমানে রূপোর মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। তবু মাসীর কথার ওপর আর একটি কথাও বলে না। মাসীর যদি সন্দেহ হয় তার ওপর, তা হলে কথা বলে তর্ক করে তো সে সন্দেহ উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

—আজই তোর মেসোকে বলবো পাত্তর ঠিক করতি। আঠার উনিশ বছর বয়েস হলো, আর কেন! আমাদের ঘরে কি ধিংগি মেয়ে মানায়? নে, হয়েছে তোর বাটনা বাটা! হয়ে থাকে তো বেগুন আর কচ্ কুটে দে! ডালনা করবো।

রাগের মাথায় তখন অনেক কথাই বলেছিল বাতাসী। রাগ পড়লে ভাবে, অমন করে না বললেই পারতো। তাই খেতে বসে বাতাসী বলতে আরম্ভ করে নতুন করে, যে, সে যা বলে তা রূপোর ভালোর জন্যেই বলে। বলাই ঠাকুর ভালো লোক, তার মতো মানুষ হয় না, তবু দেশ গাঁয়ের লোক তার নামে যা তা বলে বেড়ায়। নয়তো বলাইকে বাতাসী নিজে কোনোদিন খারাপ চোখে দেখেনি। লোকে বলে, তাই ও বলেছে, এই মাত্র। দিনকাল যা পড়েছে তাতে ভালো মানুষের স্থান নেই। যতো সব দুষ্টু বদমায়েসরাই তো এখন পোকার মতো কিলবিল করছে।

বাতাসীর সব কথা শোনার পরেও রূপো তেজ দেখিয়ে বলে, লোকে বলে বলুক গে মাসী। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকলি হোলো। কেডা কি বললে, অতো শুনতি গেলে বাঁচা যায় না।

—মুখে বলা যায় ও কথা, কিন্তু কাজে কি তা হয়!

—কেন হবে না ? রূপো দৃঢ় কণ্ঠে বলে, দুষ্টু লোকের ভয় আমি করিনে মাসী। ভয় যতো করবো, ততো ওরা পেয়ে বসবে।

বাতাসী জানে, রূপো আর কেউ নয়, মোহন্ত কাহারের নাতনী। ও ভাঙবে তবু মচকাবে না। মরবে তবু কারো কাছে মাথা হেঁট করবে না। এ বংশের ধারাই এই। রূপোর আর দোষ কি !

নিশুতি রাত।

প্রথম দিকে না ঘুমিয়ে কেটেছে রূপোর। শুয়ে শুয়ে কেবল চিন্তার জাল বুনেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে এলোমেলো চিন্তার মধ্যে।

নিশুতি রাতে আলগা ঘুম ভেঙে গেল রূপোর। কি যেন শব্দ হচ্ছে বাইরে। জানালা খোলা ছিল। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে কিছু দেখতে পায় না। অথচ বাগানের দিক থেকে শব্দ কানে আসছে। কারা যেন হুড়োহুড়ি করছে বাগানে। বিড়ির ধোঁয়ার চামসা গন্ধও নাকে আসছে। তারপর কানে আসে ফিস ফিস কথাবার্তা।

খুব সন্তর্পণে মেসোর গায়ে হাত দিয়ে ডাকে। ঘুম ভাঙতে গোলোক দেখে ইসারায় চুপ করে থাকতে বলছে রূপো।

মেসোর কানের কাছে মুখ রেখে চুপি স্বরে বলে, বাইরে বাগানে শব্দের কথা। পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ ছিল হাতের কাছে। ওটা গোলোকের সঙ্গের সাথ। দিনের মতো দেখা যায়। সূঁচের মতো অন্ধকার ভেদ করে যায় টর্চের আলো। মাঠের এপারে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বাললে ওপারের গাছপালা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেবারে গঙ্গা-সাগর যাবার পথে ওটা কিনেছিল কোলকাতা থেকে। রেখেছে অনেক যত্ন করে।

খিড়কীর দরজা বাগানের দিকে। শব্দ না হয়, এমন ভাবে আলতো করে দরজা খুলে, সেখানে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত টর্চটা ঘুরিয়ে নেয়

বাগানের চারদিকে। আট দশটা গরু ক্ষেতের ফসল তছনছ করছে। আর ক-জন লোক দাঁড়িয়েছিল বাঁচাচিতের বেড়ার কাছে। আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ার আড়ালে আত্মগোপন করেছে। এক জনকে স্পষ্ট চিনেছে গোলোক। রসিক কাহার।

গোলোক বাইরে বেরোবে বলে পা বাড়াতে, বাধা দেয় রূপো। —যেও না মেসো। ওরা শয়তান, তোমারে খুন করে ফ্যালবে।

—দে দিকিন তোর দাদুর লাঠি গাছটা, দেই হারামের বাচ্চাদের ঠাণ্ডা করে। বলে গোলোক নিজেই ঘরের কোণ থেকে লাঠিটা নিয়ে ঝড়ের বেগে বাইরে চলে যায়। জানোয়ারগুলো ততোক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে, যে যেদিকে পারে। আগান-বাগান পার হয়েই ছুটেছে। কে একজন পড়ে গেছে রাস্তার পাশে নয়নজুলিতে। গভীর নয়নজুলি। এখনো বর্ষার জল-কাদা শুকোয় নি। আজ সকালে পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা জল ছেঁচে চুনো পুঁটি, চ্যালা মাছ ধরছিল।

নয়নজুলির জল কাদায় হাবুডুবু খাচ্ছে ফণী কাহার। সর্বাঙ্গে কাদা মাখামাখি। চোখে মুখেও। গোলোক একহাতে টর্চ ধরে, অন্য হাতে ফণীকে টেনে হিঁচড়ে পথের ওপর নিয়ে আসে। ঘাড় ধরে বলে, তোমার এই কাজ! ছিঃ ছিঃ, বুড়ো হয়ে মরতে যাচ্ছো, তিন কাল গে এককালে ঠেকেছে, এখনো পরের পিছনে কাঠি দেবার চিন্তা! এবারে কোন মুমুন্দি রক্ষে করবে তোমারে?

ফণী কাঁপছে। ভীরু শৃগালের মতো। মুখে টুঁ শব্দ নেই। গোলোক ওর ঘাড় ধরে সজোরে ঝাকুনি দিয়ে বলে, এসো রূপোর ওখানে। মেয়েছেলে দে কান মলে, পিঠে কলংকে পোড়ার ছাপ দে দেবানে। মাদার গাছে পিঠ ঘষতে এয়েচো! এবারে বোঝো কেমন আরাম! এবারে যদি চিৎ করে ফেলে মুখে যদি খানিকটা গরুর-চোনা ঢেলে দেই?

লজ্জা নেই ফণীর। এই অপমান বেমালুম মুখ বুঁজে সহ্য করে। তারপর বেহায়ার মতো বলে, যা করার এখনেই করো।

ইস, বড্ড মজা, না ? বলে হিড় হিড় ক’রে টানতে টানতে ফণীকে বাড়ীর উঠোনে নিয়ে এলো গোলোক।

রূপো দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে নি। মেসোর সঙ্গে সেও বাইরে এসেছে। তিনটে বলদকে বেঁধেছে দাঁড় দিয়ে। ক’টা ছুটে পালিয়েছে। শেষটা একটা রোগাটে ষাঁড় ধরতে গিয়ে হলো বিপদ। মুলো ক্ষেতে ঢুকেছিল ষাড়টা। ধরতে যেতেই ফুঁসিয়ে এলো শিং উঁচিয়ে। তবু এগিয়ে গেল রূপো। ষাঁড়টাকে সে বাঁধবেই। পিঠে শিং ফটিয়ে দিয়েছে, তবুও। রক্ত ঝরছে, খেয়াল নেই।

বাতাসী হ্যারিকেন হাতে দাঁড়িয়েছিল পৈঠের নীচে। চীৎকার করে ডাকছে—এই রূপো চলে আয়। মরবি যে! আয়- এই দেখো, মরে বুঝি ছুঁড়ি!

—এই রূপো, এই ছ্যাখ্, বড়ো মেড়াটারে ধরে এনিচি। বাধ দিকিনি এটারে—ভাঁটার মতো জ্বলছে গোলোকের দু’টি চোখ।

ষাঁড়টা ছুটে চলে গেল রাঙাচিতের বেড়া ভেঙে। রূপো হাঁপাতে হাঁপাতে আসে। দাঁড়ায় ফণীর মুখোমুখি।

বাতাসী দূর থেকে লক্ষ্য করেছে রূপোর কাপড়ে রক্ত মাথামাখি। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, ওরে রূপো, ছ্যাখ গরু গুঁতিয়ে তোরে কি করেছে!

—করুক। রূপোর কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। উত্তেজনায় ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। ফণীকে উদ্দেশ্য করে বলে, এখনো তোমাদের গায়ের জ্বালা জুড়োয় নি? ঘরে আগুন দিলে না কেন, একেবারে পাপ চুকে যেতো।

নির্লজ্জ ফণী কাতরকণ্ঠে বলে, একটু জল দে রূপো, চোখে কাদা জল লেগে জ্বালা করতেছে।

—পাখার বাতাস দিতে হবে না? আমার গায়ে তো পচা কাদা দেছো; এবার পাড়ার লোকদের ডেকে দেখাই, তাদের মোড়লের হেনস্তা। তুমি ওরে ছেড়ো না মেসো। দড়ি দে বেঁধে

রাখো! রাত ফর্সা হলি নিতাইদারে নে শহরে যাবো। ডিপুটি বাবুর পা ধরে বলবো এদের অত্যাচারের কথা। দেখি কোমরে দড়ি বেঁধে নে যায় কি না।

রূপোর বুদ্ধির তারিফ করে গোলোক বলে, তাই যাবি। বিচার হোক্ হাকিম-হুকিমের কাছে। যেমন তার তেমনি।

যে কথা সেই কাজ। ভোরের আলো ফুটতে ফুটতে নিতাই আর চন্দরকে নিয়ে রূপো গিয়েছিল শহরে। ডেপুটিবাবু লোক ভালো। রূপো পায়ে ধরে কাঁদতে তাঁর মন ভিজেছে। নিজে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। খাঁচার মতো জাল দিয়ে ঘেরা মোটর গাড়ী করে দারোগা পুলিশ পাঠিয়েছেন চরমুকুন্দপুরে। রূপোর কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে নিজেই তাকে লোক দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ডাক্তারখানায়। ডাক্তার দেখে ওষুধ দিয়েছেন! বলেছেন সাবধানে থাকতে।

পুলিশের গাড়া এসে থামলো রূপোর বাড়ার উঠোনে। ফণীকে সেই অবস্থায় ধরে রেখেছে গোলোক। কোনো আকুতি মিনতি শোনেনি। এমন কি তেষ্টার জল চেয়েছিল, তাও দেয়নি গোলোক। মরুক বুকের ছাতি ফেটে।

পুলিশ ফণীকে হাতকড়া পরিয়ে গাড়াতে তোলে। আশ্চর্য মানুষ ফণী। রূপো বা গোলোকের হয়ে সেই আর সব আসামীদের নাম বলে গেল। কাহার পাড়ার রসিক, মদন, জীবন আর পদ, মালোপাড়ার বংকু, সুদাম আর দিগম্বর ছিল দলে। উদ্দেশ্য ছিল রূপোর ক্ষেতের ফসল নষ্ট করা। কারো কারো ইচ্ছে ছিল ঘরে আগুন দেওয়া।

মদন ছাড়া আর সবাই ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। মদন রাতারাতি কোথায় কেটে পড়েছে। পড়ুক। বৌ ছেলে মেয়ে ফেলে রেখে ক'দিন বাইরে থাকবে!

সবচেয়ে অবাক করেছে টগর। তার বাবা ঘরে ধান রাখা ডোলের মধ্যে লুকিয়ে আছে একথা সেই বলেছে পুলিশকে! বাবাকে পুলিশে ধরতে মা কেঁদে কেটে সারা। টগর কান্না দূরের কথা বরং বাবাকে শুনিয়ে বলেছে—ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। রাতে

পই পই করে মানা করলাম, শুনলে না। এখন মজা টের পাচ্ছো তো? একটা মেয়ের সব্বনাশ করতি গেরাম শুদ্যু লোক উঠে পড়ে লেগেছো, ধন্যি পুরুষ তোমরা! এখন যাও, ঘানি টানোগে।

মেয়ের কথা শুনে রসিক মাথা নীচু করেছে। ক্ষোভে, অপমানে, লজ্জায়।

পুলিশের গাড়ী ধুলো উড়িয়ে চলে গেল চরমুকুন্দপুরের পথের ওপর দিয়ে।

জামিনের জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল সুজয়। কিন্তু মহকুমা হাকিম জামিনের আবেদন না-মঞ্জুর করেছেন। তবুও চেষ্টা ছাড়ে নি সুজয়। অনেকরকম ফন্দি-ফিকির করেও কোনো ফল ফললো না।

কদিন পর টগর এলো রূপোর কাছে। মা ভাই-এর বারণ শোনে নি। শুনবে না। সকলের চোখের সামনে দিয়ে টগর এলো সই রূপোকে দেখতে।

অসুস্থ রূপো। শুয়ে আছে বিছানায়। গরু শিং ফুটিয়ে দিয়েছিল পিঠের মাংসপেশীতে। প্রথম ছ'দিন সামান্য ব্যথা ছাড়া কোনো উপসর্গ ছিল না। হয়তো সেরে যেতো ডাক্তারখানার ওষুধটা লাগালে। কিন্তু চন্দরের মার তেলপড়া দিয়েই হলো বিপদ। একরাতের মধ্যে বিষিয়ে উঠলো ক্ষতস্থান। শুরু হলো দারুণ যন্ত্রণা, সেই সঙ্গে জ্বর।

টোটকা-টুটকি জানে গোলক। কিন্তু টোটকা ওষুধে কোনো ফল হোলো না। বরং বেড়ে গেল। দগ্‌দগ্‌ করছে পিঠের মাংসপেশীর ঘা। যন্ত্রণা অসহ্য। জ্বরের মাত্রা বাড়লো বই কমলো না।

সকালে বলাই ঠাকুর এসেছিল খবর শুনে। বলে গেছে রূপোকে হাসপাতালে দেবার জন্যে। তারই কথামতো গোলোক গেছে পাড়ায়। যদি পালকিতে কাঁধ দেবার মতো ছ'জনকে পাওয়া যায়। নিতাই আর চন্দর আছে, আরো ছ'জন না হলে নয়। যদি লোক না মেলে তখন গাড়ীর ব্যবস্থা।

এই সময়ে টগরকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে রূপো।

টগর হাত বুলিয়ে দেয় রূপোর কপালে।—কাঁদিস নে। তোর চোখে জল দেখলে আমার যে·মন খারাপ হয়ে যায়।

বলতে বলতে টগরের চোখেও জলবিন্দু চিক চিক করে ওঠে। গণ্ড বেয়ে দু'এক ফোঁটা গড়িয়েও পড়ে।

—তুই এলি, তোর মা দাদা কিছু বলে নি?

—বললে শুনতেছে কেডা?

কথার মধ্যেও যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে রূপো। তিন দিন তিন রাত্রি এই রকম চলছে। হঠাৎ টগরের একখানি হাত নিজের বুকের ওপর টেনে এনে বলে, যদি মরে যাই, তাহলি সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। কিন্তু মরতে মন চায় না, এমন পিরথিবীতে কেউ মরতে চায়?

—ও সব কথা বলিসনে সই। বলতি নেই।

-কাল দাদুরে স্বপ্নে দেখিছি আমি। দাদু আমার নাম ধরে ডাকতেছে—রূপোর মুখে হাত চাপা দেয় টগর।—চুপ কর।

লোক পাওয়া যায় নি। চলতি গরুর গাড়ী যাচ্ছিল তাই ধরে এনেছে গোলোক। গাড়োয়ান অন্যগ্রামের। ছই আছে। ভালোই হয়েছে।

বাড়ী গিয়েছিল বলাই। আবার এসেছে এইমাত্র, বাড়ী থেকে নাওয়া খাওয়া সেরে। টগর চলে যাচ্ছিল। বাতাসী যেতে দেয় না। রূপোর পরনের কাপড়টা বদলে দিয়ে যেতে বলে।

বাক্স থেকে কাঁচা রাঙা-রং শাড়ী বার করে দিয়েছে বাতাসী। কাচানো ছিল। অনেক দিনের তোলা শাড়ী—আসল সিল্কের। মোহন্তর আমলের। দত্তবাবুদের বাড়ী থেকে পার্বণী হিসেবে পাওয়া।

রূপো আর টগর ছাড়া ঘরে কেউ নেই। উঠে বসতে পারে না রূপো। কাপড় বদলানো দায়। কোনোমতে পরনের শাড়ীটা

বদলে দেয় টগর। পরিপাটি করে পরানো হোলো না। তবু যা হোক হয়েছে। রূপোর মাথায় এলোমেলো রুক্ষ চুল। কদিন বিছানায় শুয়ে, তেল জল চিরুণী পড়ে না। জল হাত দিয়ে সামনের চুলগুলো আঁচড়ে দেয় টগর।

রূপো ম্লানহাস হাসে।—এতো করে সাজাচ্ছিস কেন?

—আরসী দেবো! ছাখ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

—সুন্দর হয়েই তো এতো জ্বালা! সাজবো আর কার জন্যে—ছাখবে কে?

টগর জানে রূপোর দুঃখ কোথায়। এবং কেন? টগরের মনেও তো নিশ্চিত আশা ছিল, যে রূপো ওর বৌদি হবে। গর্বে ভরে উঠতো বুক। এ গ্রাম বলে নয়, দশ বিশখানা গ্রামের কাহারের ঘরে এমন সুন্দরী মেয়ে নেই। যে দেখে সেই পাগল হয়! সত্যি, পাগল করা রূপ নিয়ে জন্মেছে রূপো। সার্থক নাম ওর। রূপো নয়, রূপসী।

গরুর গাড়ীর পাটাতনের ওপর খড়-বিচালি বিছিয়ে তার পরে বিছানা পেতে দেয় বাতাসী। নরম গদির মতো হয়েছে। নইলে এতো পথ যাবে কি করে রূপো!

চার-পাঁচ জন ধরাধরি করে রূপোকে গাড়ীতে তুললো। গোলোক যেতে পারবে না, বলাই-এর ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত। বাতাসীর মনে আজ মুহূর্তের জন্যেও বলাই-এর ওপর সন্দেহ জাগে নি। আজ এই দুর্দিনে বলাই ঠাকুর যে পরমাত্মীয়ের মতো।

গরুর গাড়ীর ছই-এর নীচে রূপো শুয়েছে বালিশে মাথা রেখে। বলাই বসেছে মাথার কাছে, গাড়োয়ানের পেছনে নিতাই। চন্দরও আসছে। তবে পায়ে হেঁটে। গরুর গাড়ী চড়তে ওর নাকি বিশ্রী লাগে।

বাতাসীর চোখ ছল ছল করছে। আহা, ভালোয় ভালোয় যেন ঘরে ফিরে আসে মেয়েটা। টগরও চোখের জল সামলাতে

পারে নি। মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলে, রূপো যেন সুস্থ হয়ে ওঠে।

গাড়ী চললো রূপোকে নিয়ে। গোলোক খানিক পথ এসে আবার ফিরে গেছে।

বাড়ী ফিরেছে টগর। একে তার মনের মেঘ তখনো কাটেনি, তার ওপর ফিরতে না ফিরতে এক পশলা ঝাঁঝালো কথা শোনালো মা। কেন সে গিয়েছিল রূপোর বাড়ী। কেন? এ কেন'র জবাব দেয়নি টগর। শুধু কটমটিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দিতে চেয়েছে উত্তর।

অথচ এই মা আগে কতো ভালোবাসতো রূপোকে। ঘরের বৌ করে আনবার জন্যে তো হু'টি হাত বাড়িয়ে রেখেছিল। আর সেই মা আজ কতো বদলে গেছে! শুধু মা কেন, দাদা তো রূপো বৈ আর কিছু জানতো না। সেই উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরীর মতো দাদার জীবনেও ছিল রূপো। মিথ্যে রটনায় দাদার মতো শক্ত মানুষের মনও বদলে গেল। আর সেইটাই সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে টগরের।

রূপোর বাড়ী থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে শুয়েছিল টগর। উঠতে বেলা গেল। বাইরে এসেই শুনলো মায়ের মুখ-ঝাম্টা, নবাবের বেটির ঘুম ভাঙলো! বুড়ি মা ঘরে আছে, ভাবনা কি? আরো যা না বলার তাই।

টগর কোনো কথাই বলে না। কথা বললে কথা বাড়বে বৈ তো নয়। মা একটানা বকে যাচ্ছে নিজের মনে। টগর মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে। কাজ বলতে শুকনো ঘুঁটেগুলো তুলে গোয়ালে সাজিয়ে রাখা।

সুজয় ফিরলো শহর থেকে। মুখ দেখেই বোঝা যায়, আজও বাবাকে সে জামিনে খালাস করতে পারে নি। খবর শুনেই মা এক ঝলক কেঁদে নিয়ে রূপোর সাত পুরুষ টেনে

গালাগালি দিতে সুরু করে। সুজয় ধমক দিতে তবে থেমেছে মা।

ক'দিন হলো সুজয়ের দোকান-পাট একরকম বন্ধ। সকাল বেলাটা খোলে। তারপর দুপুরে কোর্টে যায়। কোর্ট থেকে সোজা চলে আসে বাড়ী। বাবা নেই, বাড়ীতে এ সময় একজন পুরুষ মানুষ না থাকলে চলে না।

সন্ধ্যার পর। মা উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে আপন মনে গজর গজর করছে নীচু গলায়। টগর সন্ধ্যের আলো দেখাতে গেছে তুলসী তলায়। আলো দেখাতে গিয়ে তুলসীমঞ্চের বেদীতে মাথা ঠুকছে—যেন রূপো শীগগির ভালো হয়ে ওঠে।

আর সুজয়, ও আজ অনেকদিন পর রূপোর কথা চিন্তা করছে। রূপোকে নিয়ে ওর মনে ছিল কতো রঙীন কল্পনা। স্বপ্নের মতো সে সব কল্পনা হয়তো একদিন সত্যি হয়ে দেখা দিতো জীবনে। কিন্তু তা হোলো না। স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে গেল। কিন্তু কেন? কেন এমন হলো? নতুন করে প্রশ্ন জেগেছে মনে। প্রেম ভালোবাসা তো ছোটো বাছুরছানা নয়, যে, চিল ছোঁ মেরে উড়িয়ে নিয়ে যাবে! প্রথমে অবিশ্বাস করলেও পরে বিশ্বাস করেছিল সুজয়। ভেবেছিল, বাবা কি মিথ্যে বলতে পারে? হয়তো সুদাম মালোর ঘটনাটা অতিরঞ্জিত। যে যাই বলুক, সুজয় কখনো মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নি যে রূপো পথ চলছিল সুদামের গলা জড়িয়ে। কিন্তু বলাই ঠাকুরের সঙ্গে রূপোর মেলামেশার কথা তো কারো অজানা নয়। গ্রাম কেন, গ্রামান্তরের মানুষও এই কথা নিয়ে কানাঘুষো করে! সুজয় কি করে তা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেবে! তাইতো ও বিশ্বাস করেছিল এইসব রটনাকে! সত্যি মিথ্যে যাচাই করে দেখবার প্রবৃত্তি হয়নি।

কিন্তু আজ মনে হয়, সব মিথ্যে। এই রটনার মূলে কোনো না

কোনো উদ্দেশ্য আছে। টগর ঠিকই বলতো, 'দাদা, রূপোকে তুমি ভুল বুঝো না। রূপো একেবারে খাঁটি রূপো'।

এতো কথা আজ সকালেও চিন্তা করে নি সুজয়। তখনো রূপোকে দেখেছে বিষ নজরে। কিন্তু বিকেল বেলা বলাই ঠাকুরের সঙ্গে আদালতে দেখা হবার পর সব ওলটপালট হয়ে গেছে।

রূপোকে হাসপাতালে ভর্তি করে বলাই এসেছিল আদালতে। সুজয় ওকে দেখে প্রথমে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু বলাই উপযাচক হয়ে আলাপ করে। বলে, রূপো বোধহয় বাঁচবে না সুজয়।

—বাঁচবে না! সুজয় বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, কেন বাঁচবে না, কি হয়েছে তার?

তার পর তাচ্ছিল্যের সুরে বলে ওঠে, মরে মরুক, ও মেয়ের মরণ ওয়াই ভালো!

বলাই হেসেছিল সুজয়ের কথায়। বলেছিল, সুজয়, যদি একদিনের জন্যেও তুমি তাকে ভালোবাসতে, তাহলে ওকথা বলতে পারতে না। তুমি জানো না রূপোকে, তাই ছোটো মন নিয়ে ওকথা বলতে পারলে।

জানি জানি, সব জানি, আগে ছিল সুদাম, এখন হয়েছো তুমি—

—ছিঃ ছিঃ, তোমার মুখে দেখছি কিছু আটকায় না। আমার সম্বন্ধে কি তোমার ধারণা তা জানিনে। তবে আমার কথা আমি বলছি শোনো। রূপোকে আমি সত্যি ভালোবাসি। অমন মেয়েকে যে ভালোবাসে না, তার হৃদয় বলে পদার্থ নেই। ভালোবাসা— এক আকাশ অতো নক্ষত্রকে ভালোবাসতে পারে, একজন পুরুষ কি পারে না একটি সুন্দর মেয়েকে ভালোবাসতে? ভালোবাসাকে অতো ছোটো করে ভাবো কেন! জানো, দুনিয়ার সব কিছুই কেনাবেচা চলে, কিন্তু প্রেম, ভালোবাসা নিয়ে তা হয় না। তুমি যদি সত্যি একদিনের জন্যেও রূপোকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে আজ একথা বলছো কেমন করে—

বলাই-এর কথা শুনে সুজয়ের মনে বিস্ময় জাগে বৈকি!

বলাই আবার বলে, তোমাকে কোনোদিন ভুলতে পারবে না রূপো। আমি জানি—

—কি জানো তুমি? বলাইকে বলবার অবসর দেয় না সুজয়, বলো, তুমি কি জানো?

—এসো আমার সঙ্গে।

আদালতের বাইরে বটগাছের ছায়ায় বাঁধানো বেদীর ওপর বসে বলাই, অনেক কথা বলে সুজয়কে। বলাই ছোটবেলা থেকে ভাব-কাতুরে। সহসা উন্মনা হয়ে পড়ে। রূপোর কথা বলতে ওর কণ্ঠস্বর বারবার কেঁপে উঠছিল, আর সুজয় অবাক হয়ে শুনছিল।

সুদাম আর রূপোকে নিয়ে যে সব কথা বলেছে সুজয়ের বাবা, তার ষোল আনা মিথ্যে। আর এই মিথ্যে রটনার হেতুও আছে। গতকাল সন্ধ্যেয় ভ্যাবলার হাটে কোনো একজনের মুখ থেকেই তা জানতে পেরেছে বলাই। সুজয়ের বাবার একান্ত ইচ্ছে, সংগ্রামপুরের বিষ্টু কাহারের খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেয়। দোষের মধ্যে মেয়েটির একটি পা জন্ম থেকে খোঁড়া। নয়তো এদিকে একেবারে কুৎসিত নয়। ওই একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া বিষ্টুর আর ছেলে মেয়ে নেই। সুতরাং ও মেয়ে ঘরে আনলে বিঘে তিরিশেক ধানী জমি রসিকের ঘরে আসবে। বিয়ের পরেই জামাই মেয়ের নামে সম্পত্তি দানপত্র করে দিতে চায় বিষ্টু। তাছাড়া নগদ টাকাও বেশ কিছু আছে বিষ্টুর। যা শেষ অব্দি রসিকের ঘরেই উঠবে। রসিক জানে ছেলের মনের ইচ্ছে। জানে, ছেলে চায় রূপোকে বিয়ে করতে। এমনিতে তো ছেলেকে কিছু বলতে পারে না রসিক। পাছে ছেলে বেঁকে বসে। তাই একটা সুযোগ হাতের কাছে পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েনি রসিক। তিরিশ বিঘে সম্পত্তির লোভে রূপোর নামে যা-খুসী-তাই রটিয়ে বেড়াতে রসিকের বাধেনি। তা ছাড়া এই রটনায় কাজও হয়েছে। সুজয়ের মোহ কেটে গেছে রূপোর ওপর থেকে।

কথা-প্রসঙ্গে আরো অনেক কথা বললো বলাই। শুনে সুজয় বোবা বনে যায়। এ যে মাকড়সার মতো জাল রচনা করেছে ওর বাবা, যদিও নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছে।

—তুমি কার কাছে শুনেছো এসব কথা?

—নাম বলবো না, বলতে নিষেধ আছে। তবে এইটুকু বলতে পারি, যে বলেছে সে তোমার আমার খুব পরিচিত।

এরপর দু'জনে খানিক চুপচাপ।

তারপর গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলাই বলতে থাকে রূপোর কথা। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বলেছেন, রূপোর অসুখটা খুব বাড়াবাড়ি। জীবনের ভয় আছে। দু'দিন না কাটলে কিছু বলা যায় না। রূপোও ভয় পেয়েছে। বার বার বলছে মৃত্যুর কথা। বাড়ী থেকে গরুর গাড়ী করে হাসপাতালে আসার পথে যন্ত্রণায় আকুপাঁকু করেছে রূপো। আর বলেছে সুজয়ের কথা। বলেছে, যদি মারা যায় তাহলে সে মরেও শান্তি পাবে না, যদি না সুজয়ের দেখা পায়। সুজয়কে যে সে জীবনের সব কিছু দিতে চেয়েছিল!

এরপর বলাই গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরেছিল সুজয়ের দু'টি হাত। বলেছিল, বন্ধু বলে আমাকে বিশ্বাস করতে পারো সুজয়। আমি যা বললাম, একটি কথাও মিথ্যে নয়। এখন তোমাকে একটি অনুরোধ করবো, রূপোকে ভুল বুঝো না।

ভুল, হয়তো দারুণ ভুল করেছে সুজয়। যে ভুলের গাছপাথর নেই। তাইতো অনুশোচনায় ভরে গেছে সুজয়ের মন। ভুল যদি হয়ে থাকে, এ ভুলের মাশুল তাকে দিতেই হবে। তা যেমন করে হোক্।

—দাদা, টগর এসে দাঁড়ায় সুজয়ের পাশে।

উন্মনা সুজয়ের কানে পৌঁছয়নি টগরের ডাক। সে যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাও টের পায় নি। টগর আবার ডাকে, দাদা।

—কিরে! কিছু বলবি?

—রাগ করো নি তো?

—কেন? পরক্ষণে মনে পড়ে সকালের কথা। রূপোর বাড়ী যাওয়া নিয়ে ওকে যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করেছিল সুজয়। ম্লান হেসে বলে—কারো ওপর আর আমার রাগ নেই। তুই রাগ করিস নি তো!

—আমি রাগ করবো কেন? টগর খানিক সময় ইতস্তত করে বলে, সই হাসপাতালে গেছে দাদা। পিঠের ঘা নাকি বিষিয়েছে। শুনলাম, হাসপাতালের ডাক্তার নাকি ভয় দেখিয়েছে। এ সময় তারে একবার দেখতি গেলে না! জানো, সই কি রকমটা হয়ে গেছে যেন। সকালে আমার কাছে কত দুঃখু করলে।

ক্ষণকাল নীরব থেকে সুজয় চাপা স্বরে বলে, তোর সই হয়তো বাঁচবে না টগর।

—বাঁচবে না! আমার সই বাঁচবে না? কোনোরকমে কান্নার আবেগ চেপে টগর বলে, তুমি কি করে জানলে দাদা, কেডা বললে?

—বলাই ঠাকুরের মুখে শুনলাম!

—টগরের চোখ দু'টি জলে ভরে ওঠে। বুকের ভেতরটা কে যেন মুচড়ে দিয়ে যায়। রূপো বাঁচবে না, একথা যে ভাবতে পারে না!

রাতভোর। সারারাতের মধ্যে ঘুম নামেনি সুজয়ের চোখে। ভেবেছে রূপোর কথা, স্বপ্ন ছিল, রূপো হবে ওর জীবনের সঙ্গিনী। কিন্তু নিজের ভুলে সেই রূপো বোধহয় হারিয়ে গেল ওর জীবন থেকে।

ঘরের বাইরে এসেছে সুজয়। এখনো ভোরের আলো ফোটে নি। পাখী ডাকে নি। তার ওপর ফিকে কুয়াশার আবহাওয়া।

গ্রামপ্রান্তে খাল! গায়ে চাদর জড়িয়ে সুজয় এসে দাঁড়ায় খালের পাড়ে। রাতে না ঘুমিয়ে চোখ জ্বালা করছে। মনেও জ্বালা।

একটি মেয়েকে নিয়ে কতো কাণ্ডই না ঘটে গেল। আশ্চর্য, কেউ চিন্তা করলো না ভালোমন্দ। সুজয়, সেও বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। কেন সে এমন ভুল করলো! যদি মরে যায় রূপো—না, না।

রূপো মরে যাবে একথা ভাবতে পারে না সুজয়। বেঁচে থাকবে রূপো, নিশ্চয়ই বাঁচবে। সে না বাঁচলে সুজয়ের ভুলের মাশুল আদায় করবে কে?

—ওখানে দাঁড়িয়ে কেডা! রাতে খালের ধারে কাঠশোলার ঝোপের মধ্যে মাছধরা দোড় পেতেছিল নিতাই, তাই তুলতে এসেছে। কুয়াশার মধ্যেও দেখতে পেয়েছে সুজয়কে। চিনতেও পেরেছে। ডেকে বলে, কেডা, সুজো নাকি!

—হ্যাঁ, ওখানে কি করো নিতাই?

—দোড় তুলতিছি। তুমি কি দোকান-টোকান ছেড়ে দে বাড়ী বসে আছো নাকি? শোনলাম, রসিক জ্যাঠাবে তো এখনো জামিন ছায় নি। তা আজো যাবা নাকি কোর্টে?

সুজয় বুঝতে পারে, নিতাই তাকে কথাগুলো শোনালো ঠাট্টার সুরে। অন্যদিন হলে রাগ করতো ও। আজ রাগের বদলে নিজেই নিজেকে ধিক্কার হানে।

—বলিহারি দেই তোমাদের। একটা মেয়ের পিছনে তোমরা গাঁ শুদ্দু লাগলে। খেলা দেখালে বটে, বলে নিতাই জলে গলা ডুবিয়ে মাছের দোড় টেনে তোলে। আজ মাছ পড়েছে অনেকটা। দুটো পায়রাতলিও পড়েছে। ট্যাংরা, চিংড়ি, চুনোপুঁটি তো আছেই।

নিতাই-এর দোড় তোলার অবসরে সুজয় চলে যায়। বাড়ী নয়, গ্রাম পেরিয়ে মাঠের আলের ওপর দিয়ে সোজা বলাই ঠাকুরের বাড়ী। বলাইকে আজ দরকার।

বলাই ঠাকুর তখনো ঘুমিয়ে। সুজয়ের ডাকা-ডাকিতে ঘুম ভাঙলো। সুজয়কে পেয়ে বলাই বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলো না। ও জানতো—আজ হোক, কাল হোক, সুজয়কে আসতে হবেই ওর কাছে।

নিজের ভুল স্বীকার করে দুঃখ জানিয়ে অনেক কথা বললে সুজয়। শেষটা বলাই-এর হাত ধরে ক্ষমা চাইলো।

এসব ব্যাপারে বলাই চিরদিন নিস্পৃহ এবং উদাসীন। বলে, ভুল মানুষে করে সুজয়, এর জন্যে এতো ভেঙে পড়ার কি আছে?

—তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো তো?

বলাই হাসে! বলে, বন্ধুর কাছে কি বন্ধু ক্ষমা চায়! ওসব মনে রেখো না।

—কিন্তু আমি যে মন থেকে কিছুতেই সে সব কথা মুছে ফেলতে পারছি নে। রূপো কি আমায় ক্ষমা করবে?

—ও সব ভেবে মন খারাপ কোরো না। আগে ভালো হয়ে উঠুক সে, তারপর দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। শুধু ভুল করেছ বৈ তো নয়। যাক, তুমি কি এখন বাড়ী যাবে?

—হাঁ।

—বোসো, আমি মুখ হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে নিই। ওই পথেই তো যাবো।

—কোথায়?

—হাসপাতালে।

—আমিও যাবো!

—যাবে, সত্যি তুমি যাবে সুজয়।

বলাই-এর মুখে বিস্ময় ও খুশীর চিহ্ন।

মহকুমা-শহর বসিরহাটের হাসপাতাল। রোগীর সঙ্গে দেখা করা সম্পর্কে কড়াকড়িটা স্বাভাবিক ভাবে শিথিল এই মফঃস্বল হাসপাতালে।

প্রথমে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলো বলাই। শুনলো অনেকটা ভালো আছে রূপো। পুরোপুরি অভয় না দিলেও কিছুটা আশা প্রকাশ করেছেন ডাক্তার। হয়তো বেঁচে যাবে।

তাই হোক। বেঁচে উঠুক রূপো। আবার নতুন করে ফিরে পাক জীবন, নতুন করে দেখুক পৃথিবীর আলো, নতুন করে নিঃশ্বাস নিক বাতাসে।

খুশীর অন্ত নেই বলাই-এর। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে সুজয়ের গলা। গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে সুজয় দাঁড়িয়েছিল হাসপাতালের প্রাঙ্গণে।

বলাই আনন্দ-উতলা কণ্ঠে বলতে থাকে, আমি জানতাম, রূপো মরবে না। মরতে পারে না। ও মেয়ে যদি মরে, তাহলে বাঁচবে কে! [illegible] ভক্তি করে ওকে।

পরক্ষণে বলে, এই ছাখো, পাগলের মতো কি যা তা বলছি!

—রূপোকে দেখতে যাবে না? চলো!

—শুনলাম, ঘুমোচ্ছে।

একবার দূর থেকে দেখে চলে যাবো। চল ডাক্তারবাবুর কাছে অনুমতি নিয়ে আসি।

রূপো ঘুমোচ্ছে। বুক অবধি কম্বলে ঢাকা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঢলঢলে মুখখানি। ঠিক তেমনি আছে। শুধু একটু ফ্যাকাশে বিবর্ণ। সুজয় দেখছে অপলক দৃষ্টিতে, শেষ হয় না দেখা। কতো চেনা-জানা, অথচ কতো নূতন। কি সুন্দর মুখ, অমলিন! ওই মুখে কালির পোঁচ টানতে চেয়েছিল গাঁয়ের লোক। কতো রকমে ওই একটি মেয়েকে সবরকমে জব্দ করতে চেষ্টা করেছিল কাহার সমাজ! সুজয়ও সেই অপরাধে অপরাধী।

অজ্ঞাতে সুজয়ের দু'টি চোখ ছলছলিয়ে ওঠে!

দু'দিন পরের কথা

বিকেলের দিকে হাজত থেকে বেরোলো রসিক, ফণী ও আর যারা ছিল সবাই। এতোদিন পর আজ জামিন দিয়েছেন ডেপুটি সাহেব।

রসিক আশা করেছিল হাজতের বাইরে সুজয়ের দেখা পাবে। কিন্তু কাছে-পিঠে তো সে নেই! ছাখে বলাই দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মোড়ে। দাঁড়িয়ে আড়চোখে এদের দিকে দেখছে।

এখনো বিষ দাঁতের ধার কমেনি রসিকের। কাছে এসে বলাইকে লক্ষ্য করে বলে, কি, এখানে মজা দেখতে এয়েচো?

ফণী অশ্লীল ভঙ্গীতে ব্যঙ্গোক্তি করে, কতো রঙ্গ জানো ঠাকুর। রূপোর সঙ্গে খুব পিরিত জমিয়েছো বাবা।

শুনেও শোনেনি, এমন নিস্পৃহ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলো বলাই। না পেরে ফণী ওর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলে—ও ছুঁড়িরে বে করবা নাকি!

বলাই কটমট করে তাকায় ফণীর দিকে।—এখনো কি আক্কেল হয়নি, যাও নিজের চরকায় তেল দাও গে।

—ফুঃ, ফণী কদর্য ভাষায় বলে, সোনার চাঁদ—রূপোর গা'র ঘাম চেটে মুখ খুলে গেছে দেখতিছি।

এতোক্ষণে রুখে দাঁড়ায় বলাই।—মুখ সামলে কথা বোলো। হাজতে থেকে তো মড়ার আকার হয়েছে সব। বলি, এ মুখে লোকালয়ে যাবে কি করে! যাও চাটগাদায় মুখ ঘঁসে অপমানের কালি মুছে ফ্যালো।

থোঁতা মুখ ভোঁতা করে একে একে চলে গেল সবাই। বলাই আপন মনে হেসে উঠলো একবার।

সুজয় ফল কিনতে গিয়েছিল বাজারে। ফিরলো এতোক্ষণে। ইচ্ছে করে দেরী করেছে। পাছে বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—এই কারণে।

ঠোঙা-ভরতি কমলালেবু আর বেদানা বলাই-এর হাতে দিয়ে

সুজয় বলে, আমি ওই চায়ের দোকানটায় বসি, তুমি এগুলো রূপোকে দিয়ে এসো ভাই।

—কেন, তুমি যাবে না?

—না।

—আরে, চলো না।

—না, এ মুখ দেখাতে ইচ্ছে নেই!

—কিন্তু ও মুখ তো তাকে দেখাতে হবে সুজয়।

—তা হোক, আজ আমি যেতে পারবো না বলাই।

কিছুতেই রূপোকে দেখতে গেল না সুজয়। বসলো চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে। অগত্যা বলাই একা এলো রূপোকে দেখতে।

ফলের ঠোঙা দেখে রূপো বলে, রোজ রোজ এতো ফল নে এসো কেন ঠাকুর? আমি কি সব খাতি পারি? ওই গ্যাখো, কালকের গুলো পড়ে রয়েছে।

রূপোর পাশের শয্যায় একটি কিশোর বয়সের ছেলে। অসুস্থ অবস্থায় দেড় মাস হাসপাতালে আছে। ছেলেটি ঠোঙা ভরতি ফলগুলোর দিকে দেখছিল হাপুস নয়নে। রূপো তাকে দেখিয়ে বলে, ওরে অদ্ধেক ফল দে দেই, খায়। ওর মা বাপ গরীব, শুধু চোখের দেখা দেখে যায়। কিছু দিতে পারে না। ওর নাম কি জানো—ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে রূপো মৃদু হাসে, ওর নাম তুষ্টু। আমারে দিদি বলে ডাকে।

—বাঃ, বলাই একবার ছেলেটি, আর একবার রূপোর মুখের দিকে চায়। তা হলে ভাই বোনে খাসা আছো।

—মেসো সকালে এইছিল। বললে বিকেলে আসবে, কই এলো না তো?

—আমি আসছি জেনেই আসেনি। তোমার মাসী তো অনেক কিছু মানত করে বসে আছে। তুমি সেরে উঠলে সত্যনারায়ণের

পূজো করবে, কালী পূজো দেবে নৈহাটীর মণিগোঁসাই-এর কালী বাড়ী, তারপর আরো কি কি--মনে পড়ছে না।

খানিক চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবে রূপো। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, যদি মরে য্যাতাম, খুব ভালো হোতো।

—পাগল, মরে গেলে তো জীবনের সবই ফুরিয়ে গেল।

—আমার তো সব ফুরিয়ে গেছে। রূপো চেয়ে চেয়ে কী যেন খোঁজে বলাই-এর চোখে। গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, যারে জীবনের সব কিছু দিতে গ্যালাম, সে কিছু নেলে না। তোমারে তো আমি কিছু দেই নি ঠাকুর, তবে আমারে এতো দিলে কেন?

সহজ সরল জিজ্ঞাসা। অথচ এ জিজ্ঞাসার উত্তরের ভাষা জানা নেই বলাই-এর। শুধু অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রূপোর মুখের দিকে।

রূপো বলে, কাল রাত্তিরে দাদুরে স্বপ্ন দেখিচি। দাদু আমায় ডাকতে এইছিল। বলিচি এখন যাবো না। যদি যাবো বলতাম, তা হলি দাদু আমারে নে যেতো।

রূপো বলছে বলুক। যা খুশী বলুক। বলাই মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে বলছে, আমার জন্যে নয়, কারো জন্যে নয়, তোমাকে তোমার জন্যেই বাঁচতে হবে রূপো। দেখবে এই পৃথিবীটা আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে, আরো ফুল ফুটছে, আরো পাখী গান গাইছে তোমার জন্যে! দেখো, আমারে তখন তুমি ভুলো না।

বলাই-এর মনের গভীরে একট ব্যথা, একটু হাহাকার।

—কি ভাবতেছো?

—কিছু না।

উঠে দাঁড়ায় বলাই। বলে, আমি যাই, ওদিকে সুজয় দাঁড়িয়ে আছে।

—কে দাঁড়িয়ে আছে, কে! রূপোর মুখের প্রতিটি রেখায় বিস্ময়।

অন্যমনস্ক ভাবে সুজয়ের নাম বলে ফেলেছে বলাই।

রূপো বলে, শুনতে পেইছি। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে কেন?

—তোমাকে দেখতে এসেছিল। কিন্তু দেখা দিতে পারেনি। যদি তুমি তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নাও।

রূপো আর কোনো কথা বললো না। শুধু মুহূর্তের জন্যে বলাই-এর মুখের দিকে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন বলতে চেয়েও, না বলে পাশ ফিরে শোয়।

বলাই চলে এলো হাসপাতালের বাইরে। যেখানে নিমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে সুজয়। বলাই আসতে জিজ্ঞাসা করে—কেমন আছে রূপো?

—ভালো আছে, দু'চার দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

দু'জন একসঙ্গে ফিরছে মেঠো পথ দিয়ে। অন্যদিন কতো কথা বলে ব[illegible]। আজ একটি কথা নেই ওর মুখে। ওর সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে।

চরমুকুন্দপুর পোঁছতে সন্ধ্যা উতরে গেল। সুজয়ের বাড়ী তো এখানেই। বলাইকে যেতে হবে এখনো মাইল খানেক পথ। সুজয় সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ নিঃসঙ্গতা ভালো লাগছে বলাই-এর।

বাড়ী পোঁছেই সুজয় দেখে, ওদের বড়ো ঘরের দেওয়ালে রীতি মতো জটলা। পাড়ার অনেকেই রয়েছে। তার মধ্যে ফণীকাকার গলাটাই কানে আসছে সুজয়ের। কি গরম গরম কথাই বলছে।

রূপোর মেসো গোলককেও দেখতে পেল সুজয়। বসে আছে একান্তে।

এতোগুলো লোক বোধহয় সুজয়ের জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

—আরে, কোথায় ছিলে সুজো? দেরী করলে কেন? ফণী বলে, তোমার জন্যি ত' বসে আছি।

—আমার সঙ্গে কারো কোনো দরকার আছে বলে মনে করি

নে। সুজয় ফরফর করে সোজা ঘরের মধ্যে চলে যায়। ঘরে ঢুকতেই মা নাকিসুরে রান্নার রং মিলিয়ে বলে ওঠে, খোকারে—ওনার চেহারা দেখেছিস—ক'দিনে শুকিয়ে দড়ি পানা হয়ে গেছে।

—চুপ করো মা।. বলে সুজয় গুম হয়ে বসে পড়ে তক্তপোষের ওপর।

মায়ের নাকি সুরে কান্না তবু থামে না। শেষটা রূপোর বাপান্ত করতে আরম্ভ করে।

—তোমাদের প্যানপ্যানানি ভালো লাগে না।

সুজয়ের বিরক্তি প্রকাশে মা একটু থতমত খেয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকায়।

সুজয় ডাক দেয় টগরকে। টগর পাশের কুটরিতে ছিল। দাদার ডাক শুনে এ ঘরে এলো।

—এক ঘটি জল দে তো!

বাতাসা আর জলের ঘটি দাদার হাতে দিয়ে টগর জিজ্ঞাসা করে, এতো দেরী করে এলে?

—বলছি, বাতাসা ক'খানা মুখে ফেলে ঢক্ ঢক্ করে এক ঘটি জল নিঃশেষে পান করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে সুজয়।—সব বুঝতে পেরেছি টগব! সব বুঝতে পেরেছি!

মা ঘরে নেই! ছেলের রকম সকম দেখে অন্য ঘরে গেছে। তাই সাহস পেয়ে টগর বলে, যদি আরো ক'দিন আগে বুঝতি পারতে, তা হলি এতো কিছু ঘটতো না।

সুজয় স্পষ্ট করে কিছু না বললেও টগর বুঝতে পারে যে দাদার মনের পরিবর্তন হয়েছে। ভালোই হোলো। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।

—সংগ্রামপুরের বিষ্টু না কে—এয়েছে শোনলাম তোমার বে'র সম্বন্ধ পাকাপাকি করতি। মেয়েটা খোঁড়া!

—দূর তোর নিকুচি করেছে বিয়ের! উপর দিকে থু থু ফেললে

যে নিজের গায়ে পড়ে। নয়তো দেখিয়ে দিতাম মজা। এই, রূপোর মেসো এয়েচে কেনরে ?

টগর যা বলে, অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস করে সুজয়। রূপোর মেসো গোলোককে লোক পাঠিয়ে এখানে ডেকে এনেছে। এখানে যারা এসেছে, ওরা একযোগে বলবে রূপোর বিয়ের কথা। পনের দিনের মধ্যে বিয়ে দিলে সমাজের সঙ্গে আর কোনো গোলমাল থাকবে না। যে কোনো উপায়ে হোক পনের দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে রূপোর! ও মেয়ে আর আইবুড়ো রাখা চলবে না। তা যদি থাকে, গ্রামের বাস তুলে উঠে যেতে হবে রূপোকে। না গেলে চাল কেটে তুলে দেবে!

সুজয় রুখে ওঠে টগরের কথা শুনে। বলে—দাঁড়া, সব পাকামি বার করছি। বাবা কাকা মানবো না। তা যা হয় হোক।

বাইরে থেকে গলা ঝাড়া দিয়ে রসিক নিজেই এলো ঘরে, ছেলেকে ডাকতে. সুজয় স্পষ্ট বলে দেয় বাপের মুখের উপর, সামাজিক ঘোঁটে সে যাবে না।

—সে কি করে হয়? গাঁয়ের সবাই এয়েচে, সংগ্রামপুরের বিষ্টুও রয়েচে, আয়।

—না।

—না মানে!

—না মানে, না।

—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

খানিক নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু ভাবলো সুজয়। তারপর বলে, চলো যাচ্ছি।

প্রথমে গোলোকের সঙ্গে চোখোচোখি হলো সুজয়ের। গতকাল বলাই ঠাকুরের মুখে সবই শুনেছে গোলোক। শুনে মনে মনে খুশীই হয়েছে। শুধু রূপোর নয়, তার দাদুরও ইচ্ছে ছিল সুজয়কে জামাই করার। আর গোলোকেরও কোনদিন অনিচ্ছা ছিল না। সুজয়কে তো সে অনেকদিন থেকে চেনে, জানে।

এ তল্লাটে কাহার সমাজের মধ্যে অমন ছেলে নেই। যেমন রূপ, তেমন গুণ। গভীর আশা নিয়ে গোলোক চেয়ে থাকে সুজয়ের মুখের দিকে। তবে কি সত্যি সুজয় তার ভুল বুঝতে পেরেছে?

সুদামকেও দেখতে পেলো সুজয়। লাল রুমাল গলায় জড়িয়ে বেশ সাজগোজ করে ফতোবাবুটির মতো বসে আছে লোকজনের মধ্যে। গা-পিত্তি জ্বলে ওঠে সুজয়ের। রাগ সামলাতে পারে না। বলে ওঠে সুদামের দিকে আঙুল উঁচিয়ে, ওই জানোয়ারটা এখেনে কেন?

যেন মৌচাকে ঢিল পড়েছে। এ-ওর মুখের দিকে চায়। সুদাম উঠে পড়ে আসন ছেড়ে। সেও কম যায় না। রসিককে শুনিয়ে বলে, এভাবে বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান করার কি দরকার ছিল?

—যাঃ যাঃ, উল্লুক কোথাকার। সুজয় দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওঠে। ব্যাপার দেখে হাঁ হাঁ করে এগিয়ে আসে রসিক। ছেলের দু'টি হাত ধরে বলে, কি হয়েছে তোর? ওদের আমি ডেকেচি; কুলটা রূপোর—

—বাবা! বাধা দিয়ে সুজয় বলে ওঠে, মাথা আমার খারাপ হয়নি। কি বলবো, আজ না হাজত থেকে খালাস পেলে তোমরা? এতেও লজ্জা হয় না?

রসিকের উঁচু মাথা নীচু হয়ে যায় ছেলের কথায়। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। চোখের সামনে দিয়ে একে একে সবাই চলে গেল। সুজয়ের ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস করলো না।

বসেছিল সংগ্রামপুরের বিষ্টু আর রূপোর মেসো গোলোক। ভাবগতিক দেখে বিষ্টুও হতাশভাবে উঠে দাঁড়ায়। বলে, রসিক, আজ আমি যাচ্ছি। এই ডামাডোলের মধ্যে আর শুভকাজের কথা কওয়া ঠিক হবে না। পরে একদিন আসবো। বাবাজীরও আজ মাথার ঠিক নেই।

রসিক নিরুত্তর। বিষ্টুও চলে যাচ্ছিল ভালো-মন্দ উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে না থেকে। পিছু ডাকে সুজয়।

—শুনুন, আমার কথায় রাগ করবেন না! মেয়ের বিয়ের জন্যে অন্য ছেলে দেখুন। বাবা কথা দিলেও আমি বিয়ে করতে পারবো না।

সুজয়ের কথায় বিষ্টুর চোখ তো কপালে উঠলো। অনেক আশা করেই খোঁড়া মেয়েটাকে এই ছেলের ঘাড়ে গছাতে চেয়েছিলো।

রসিক বলে, পাগলের মতো কি বলছিস তুই? আমি যে বিষ্টুদারে কথা দিইছি।

বাপ ছেলের কথার মধ্যে না থেকে বিষ্টু আস্তে আস্তে সরে পড়লো। গোলোক এতক্ষণে আসন ত্যাগ করে। যাবার সময় রসিককে বলে যায়, রসিকদা দিন কাল বদলে গেছে। একটু খেয়াল করে চলা ভালো, নচেৎ ঠকতে হয়।

ওদিকে চৌকাঠে মাথা ঠুকতে ঠুকতে সুজয়ের মা মড়া-কান্না কাঁদতে আরম্ভ করে, ওগো আমার কি সব্যনাশ হোলো গো। আমার ছেলেরে কেডা গুন করেছে গো—

—মা চুপ করো। বলে ধমকে ওঠে সুজয়। দুপদাপ পা ফেলে সটান ঘরের মধ্যে গিয়ে আপন মনে গজরাতে থাকে।

সুজয়ের মায়ের কান্না থেমেছে। মা বেশ বুঝতে পেরেছে, চোখের জলে বান ডাকলেও ছেলের মন ভিজবে না। যা এক-রোখা ছেলে? রসিকও মুখ বন্ধ করেছে। জানে, ও ছেলেকে জোর করে কোনো কিছু বোঝানো যাবে না। দুঃখ সে জন্যে নয়। দুঃখ যে, বিষ্টুর তিরিশ বিঘের মতো জমি বেহাত হয়ে গেল। টগরের কিন্তু খুসীর অন্ত নেই। আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠেছে ওর মুখ। হাসি উপচে পড়ছে।

—টগর, এই টগর!

রান্নাঘরে ছিল টগর! একরকম ছুটতে ছুটতে আসে দাদার ডাক শুনে।

—কি বলতেছ ?

—আর একটু খাবার জল দে দিকি—গলাটা শুকোচ্ছে।

জলপান করে সুজয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। ফিরে চায় টগরের মুখের দিকে। টগরও তেমন সুযোগ বুঝে জিজ্ঞাসা করে :

—দাদা, কবে আসবে রূপো !

—যা বাজে বকিস নে ! কে কবে আসবে তা আমি কি করে জানবো ?

—আহা তুমি যেন বোকা ছেলে, কিছু জানো না !

—বড় ফাজিল হয়েছিস্।

—ইস্ ! বলে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে টগর চলে যায়।

ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে অস্বস্তি হয় সুজয়ের। না পেরে বাইরে যাবে বলে বেরোয়।

মা ছিল রান্নাঘরের দাওয়ায়। জিজ্ঞাসা করে, কমনে যাচ্ছিস্ ? আলো নে যা।

—দরকার নেই। বলে অন্ধকারে হন্ হন করে চলতে আরম্ভ করে সুজয়। যাবে রূপোর মেসোর কাছে।

দাওয়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে মৌজ করে তামাক খাচ্ছিল গোলোক। সুজয় এসেই পায়ের ধুলো নেয়।

—বোসো ! হুঁকোয় সুখ টান দিয়ে গাল ভরা ধোঁয়া ছাড়ে গোলোক। বলে, কি সমাচার ?

কি বলবে না বলবে কিছুই ঠিক পায় না সুজয়। শুধু উস্‌খুস করাই সার।

গোলক বলে, তা কথা-টথা বলো।

—বলবার কিছু নেই ! সুজয় অনুচ্চকণ্ঠে বলে, ঘটনা যে এতদূর গড়াবে আমি বুঝতে পারি নি।

বোঝা উচিত ছিল। আমাদের মতো তো তুমি মুখ্যু নও, তারপর গেরামে পড়ে থেকো না। যাহোক একটু পেটে কালির

জলও আছে, তুমি যে এসব ছ্যাঁচড়া তালে যে থাকবা এ আমি ধারণা করি নি।

—ওসব বলে আর আমায় লজ্জা দেবেন না। রূপোর মতো আমিও তো আপনারে মেসো বলে ডেকেছি। আমি ক্ষমা চাইতে এয়েচি আপনাদের কাছে। মাসী কোথায়?

—ওগো, তোমারে সুজো ডাকতেছে। গোলোক গলা ছেড়ে বাতাসীকে ডাকে, ইদিকে এসো!

রান্নাঘরে ছিল বাতাসী। স্বামীর ডাকে বাইরে এলো এঁটো হাত ধুয়ে। এসেই সুজয়ের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, হঠাৎ মাসীর খোঁজ পড়লো কেন?

আজ যেন কি হয়েছে সুজয়ের! মাসীকেও প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে। বাতাসী বলে, থাক, পেরণাম করে পাপ কুড়িও না।

—মাসী। রূপোর সম্পর্কে ছোটোবেলা থেকে বাতাসীকে মাসী বলে ডেকেছে সুজয়! আবার বাতাসীও ওকে দেখেছে আপন বোনপোর মতো! সুজয় অনুশোচনার সুরে বলে, আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি মাসী।

—থাক। ক্ষমা-টমা চাইতে হবে না, গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে কি করবা? ট্যারা চাউনিতে সুজয়ের দিকে চেয়ে বাতাসী বলে, আমি যাই, ভাত চড়িয়ে এয়েচি!

বাতাসী চলে গেল। ওর কথার ধরণ দেখে সুজয় অনুমান করেছে, এখনো যথেষ্ট রাগ আছে মাসীর মনে।

গোলোক বলে, রাগ করলে সুজো!

—না, না, রাগ করবো কেন! অন্যায় তো আমারি, বলতে বলতে কেমন যেন উতলা হয়ে ওঠে সুজয়। উঠতে যাবে এমন সময় গোলোক টেনে ধরে ওর একটি হাত। বলে, আরে বসো, এই তো এলে!

সুজয় ফিরে তাকায় গোলোকের মুখের দিকে। বরাবরই

স্থির স্বভাবের মানুষ গোলোক। ঝঞ্ঝাট ভালোবাসে না! বলে, আমি সব বুঝতে পারতেছি সুজো। এরকম ব্যাপার ঘটবে রূপোরে নে, এ কোনোদিন ধারণাও করি নি। এসব কপালের ফের, দুষ্টু গেরোর কোপে এরকমটা হয়। তাই বলতেছি, ওসব পুরোনো কাসুন্দে ঘেঁটে মন খারাপ করো না। ধরো, রূপোর তো একরকম কেউ নেই বললি হয়। এখন যাহোক করে মেয়েটারে ভালো ঘর ভালো বর দেখে পার করতি পারলি আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, মেয়েটাও বাঁচে। তা তোমারে আর কি বলবো—বোঝো তো সব। তাই বলতিছি, আর যেন না কোরো না।

—কিন্তু—

—কোনো কিন্তু-টিন্তু নয়। আমি বললি কেউ অমত করবে না। এখন তুমি যদি হাঁ করো তা হলি হবে।

—সে ভাগ্য কি আমার হবে? সুজয়ের কণ্ঠস্বরে আকূতি!

—হবে, হবে—গোলোক জোরালো ভাষায় বলে, এই মাসেই হবে শুভ কাজ। দেখি কি করে না হয়ে যায়!

হাসপাতাল!

রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। একটু আগেও জেগেছিল রূপো। আজ যেন কি হয়েছিলো ওর। কিছুতেই চোখের পাতা বন্ধ করতে পারছিল না। বারবার ভেবেছে নিজের জীবনের কথা! ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়েও নিস্তার নেই! স্বপ্নে এসে দেখা দিয়েছে একটি মানুষ। সুজয়। পাশাপাশি আরো একজন বলাই ঠাকুর! একটি জীবন। একটি নদী। এক তীরে ভাঙন ধরেছিল, সেই অবসরে আর এক তীর গড়ে উঠেছে।

সুজয়! কতো আশা ছিল তাকে নিয়ে। সে আশা-কুসুম ফুটতে না ফুটতে শুকিয়ে গেল। নতুন আশার আলো নিয়ে এলো বলাই ঠাকুর! সব ঘটনাই যেন কাকতালীয়। রূপো স্বপ্নে

দেখছে, সুজয় দু'টি হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে। আর বলাই ঠাকুর কাছে দাঁড়িয়েও কেমন যেন উদাসীন।

স্বপ্ন দেখা শেষ হোলো।. এদিকে রাতও ফুরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে রোদ এসেছে হাসপাতালের ঘরে। শীতের সকালের মিষ্টি রোদ। রূপো উঠে বসে বিছানায়! অন্যদিনের চেয়ে শরীর আজ ঝরঝরে। শুধু পিছনে মাংসপেশীতে সামান্য ব্যথা।

আজ এই সাত-সকালে দাদুর কথা মনে পড়ছে। দাদু একশ' বছরের পুরোনো একটি মানুষ। একশ' বছরের কথা যে মানুষটা জানতো, সেই দাদু আজ নেই। পাষণ্ডরা খুন করেছে। রূপোর বাড়ীর সামনে একটি কুরুবকের গাছ আছে। গাছটাকে কতো যত্ন করে ও। কোনোদিন একটি পল্লব ও ভুল করেও ভাঙে না। আর গ্রামের পাষণ্ডগুলো কি? একটি মানুষকে মেরে ফেললো!

—উঃ. অস্ফুট আওয়াজ বেরোয় রূপোর মুখ দিয়ে। দাদু মরে গেছে। চোখের সামনে ভাসছে দাদুর চেহারা। যেন কালো পাথরে গড়া একটি মানুষ। কাশফুলের মতো মাথার চুল। অতো বয়েসেও আঁট সাঁট ছিল দাদুর দেহ। রক্তের রং এতটুকু ফিকে হয় নি। কতো রক্ত বেরিয়েছিল দাদুর দেহ থেকে। চন্দরদার উঠোনের মাটি লাল হয়ে গিয়েছিল। ঘাড়ের ওপর দায়ের কোপ মেরেছিল। ধাবালো দা। শক্ত হাড়, তাই মাথাটা নেমে যায়নি দেহ থেকে। মরবার পরেও দাদুর চোখ দু'টি বন্ধ হয়নি। কি যেন দেখছিল চোখ চেয়ে।

আর ভাবতে পারে না রূপো। চোখের সামনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

—রূপো, ও রূপো।

বলাই-এর ডাকে রূপোর চমক ভাঙে। এতো সকালে তে কোনোদিন আসে না বলাই ঠাকুর। জিজ্ঞাসা করে—এতে সকালে যে?

—একটা সাইকেল পেলাম, তাই চলে এসেছি। নার্সের অনুমতি নিয়ে বলাই ঘরে ঢোকে। বলে, আজকের দিনটা তো শুধু! কাল বিকেলে তোমায় বাড়ী যেতে হবে। গরুর গাড়ী নিয়ে সুজয় নিজে আসবে বলেছে।

—ঠাকুর! সবিস্ময়ে রূপো ফিরে তাকায়। বলাই হেসে জানায়, সুজয় আসবে তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে।

—না, সে কেন আসবে! সে আমার কেউ নয়। বলতে বলতে ছল ছল করে ওঠে রূপোর হু'টি চোখ।

—একদিন তাকেই তো জীবন মন দিয়েছিলে রূপো। তবে, আজ কেন ও কথা বলছো? বলাই-এর কণ্ঠস্বর শান্ত সংযত। বলে, না পোড়ালে কাঁচা সোনা পাকা হয় না।

—কিন্তু—

—কোনো কিন্তু নয় রূপো। সুজয় ভুল করেছে, মারাত্মক ভুল। তাকে ভুল শোধরাবার সুযোগ তোমাকে দিতে হবে।

তবু রূপোর মনে দ্বিধা। ভাবে, আবার ও কেমন করে ভালোবাসবে সুজয়কে। বলে, সে হয় না ঠাকুব।

—কেন হবে না? বলাই বলে, বিশ্বাস করো, আমি বলছি সুজয় সত্যি তোমাকে ভালোবাসে। তাকে পেয়ে তুমি সুখী হবে।

অন্য দিনের চেয়ে বলাই ঠাকুরকে আজ বড়ো বেশী উন্মনা মনে হয় রূপোর, কিছুটা গম্ভীরও। কিন্তু কেন? তবে কি বলাই ঠাকুর ওকে ভালোবেসেছিলো? কিসের যেন ছায়া জড়িয়ে রয়েছে বলাই-এর চোখে। অনুরূপ ছায়া রূপোর মনের অংগনেও পড়েছে। তবে কি ওদের অজ্ঞাতে ওরা পরস্পরকে ভালোবাসার বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে?

—দেখো, তোমাকে ভালোবাসি বলেই একথা বলতে পারলাম, —বলাই যেন অন্তর্যামী। রূপোর মনের কথা বুঝতে পেরেছে, বলে, সুজয়কে পেয়ে তুমি সুখী হবে রূপো।

—কিন্তু তুমি ? অফুরন্ত জিজ্ঞাসা রূপোর দৃষ্টিতে।

—আমার সুখ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না রূপো। বলাই উতলা হয়ে পড়ে! বলে, আমি যাই।

রূপো হাসে। ম্লান হাসি। বুঝতে পারে কেন আজ বলাই ঠাকুরের ফিরে যাবার তাড়া। বলে, বোসো, এই তো এলে।

—আবার তো দেখা হবে। আমি অনেক কাজ ফেলে এসেছি।

—তবে যাও। অভিমানে গুমরে ওঠে রূপোর মন। বলে, আমার জন্যি অনেক কাজের ক্ষেতি করেছো, আর কোরো না।

বলাই ঠাকুর চলে গেছে। অন্যদিন যাবার আগে বার বার ফিরে তাকায় রূপোর দিকে। থমকে দাঁড়ায়। আজ থমকে দাঁড়ানো দূরের কথা, একবার ফিরেও তাকালো না। রূপো দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করে। ওর চোখ দু'টি সজল হয়ে ওঠে। আজ বলাই ঠাকুর এসে শূন্য অন্তর আরো শূন্য করে দিয়ে গেল।

পরদিন।

সকাল থেকে রূপো ভেবেছে, কখন সকাল দুপুর শেষে বিকেল হবে। কখন হাসপাতালের বাইরে যাবে সে! কখন বলাই ঠাকুর মিষ্টি সুরে ডাকবে ওর নাম ধরে।

কতো আনন্দ রূপোর মনে! গরুর গাড়ী চেপে মাঠ ঘাট পেরিয়ে আজ ও বাড়ী যাবে! না, না, গরুর গাড়ীতে নয়। হেঁটে যাবে। দেখতে দেখতে যাবে শহরের পথ ঘাট। তারপর মাঠের রাস্তায় পোঁছে না হয় গরুর গাড়ীতে উঠবে।

কিন্তু যদি সে আসে! নিশ্চয়ই আসবে সুজয়! বলাই ঠাকুর মিথ্যে বলে না। আসবে আসুক, কিছুতেই প্রথমে কথা বলবে না রূপো। কেন বলবে! কি সম্পর্ক ওর সঙ্গে! যে সম্পর্ক ছিল সে তো নেই।

আকাঙ্ক্ষিত বিকেল এলো। একা একা হেঁটে বাইরে এসেছে

রূপো। শুধু গোলোক মেসো এসেছে আর কাউকে দেখছে না তো।

গোলোক মেসোর দু'টি হাত ধরে রূপো কাঁদতে আরম্ভ করে। বলে, এতোতেও মরণ হোলো না মেসো।

রূপোকে বুকে জড়িয়ে গোলোক বলে, দূব পাগ্‌লী, ওসব কথা বলতি আছে? মবণ কামনা কবতি নেই, বুঝলি? নে আয় দেখ্‌বি আবার তোব নতুন কবে বাঁচতি ইচ্ছে করতেছে।

হাসপাতালের প্রাঙ্গণে কৃষ্ণচূড়া গাছেব নীচে ছই তোলা গরুর গাড়ী। নিতাই এসেছে গাড়ী চালিয়ে। এতো সময় রূপো দেখতে পায় নি ওকে।

যেদিন হাসপাতালে আসে সেদিন নিতাই-এর চোখে জল ঝরেছিল। আর আজ! যেন চাপা আনন্দ উপচে পড়ছে।

—ভালো আছো নিতাইদা? রূপোই প্রথমে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে, বলে, তুমি যেন বড্ড রোগা হয়ে গেছো।

—ও তোমার চোখেব দোষ। রোগা দেখছো কোন ঠাঁই? যেমন ছিলাম তেমনি রইচি। ববং তোমার সোনার অঙ্গে কালি ঢেলে দিয়েছে।

মেসোকে কাছে-পিঠে না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে—মেসো কোথায় গেলো নিতাইদা?

—ওই তো যাচ্ছে! বলে আঙুল উচিয়ে নিতাই দেখিয়ে দেয়। —ধামা কাঁধে নিয়ে মেসো হন্ হন্ কবে যাচ্ছে কোথায় ওদিকে? মেসো যাবে না আমার সঙ্গে?

—না হাট-বেসাতি কবে তারপব বাড়ী ফিরবে। নিতাই বলে, আজ রাতে তোমার মেসো যে আমাদের নেমন্তন্ন করেছে। বাড়ী গে দেখো কি ব্যাপার!

ওপাশে, অর্থাৎ গাড়ীর ছইএর আড়ালে দাঁড়িয়েছিল সুজয়। নিতাই-এর হাত ধরে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে রূপো দেখতে পেলো সুজয়কে। প্রথম দেখার বিস্ময়! হঠাৎ মাথাটা ঘুরে যায় রূপোর। সুজয় এগিয়ে এসে দাঁড়ায় রূপোর মুখোমুখি। কিছু

বলতে গিয়েও বলতে পারে না। শুধু ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলো মুহূর্তের জন্যে।

রূপো এতোক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে, জিজ্ঞাসা করে, বলাই ঠাকুর এলো না কেন? নিতাই কোনো কথাই বলে না, শুধু সুজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের ইংগিতে কি যেন জানায়।

রূপোর দু'চোখের জলধারা গড়িয়ে পড়ছে গণ্ড বেয়ে। ও আগেই মনে বুঝেছিল বলাই ঠাকুর আসবে না।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে রূপো গাড়ীতে ওঠে। সুজয় ছইয়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে বলে, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

রূপো কোনো কথা না বলে আঁচলে চোখ মুছে ছই ঠেসান দিয়ে বসে। নিতাই গরু জোড়ার কাঁধে চাপিয়ে দেয় গাড়ীর জোয়াল। তারপর নিজে উঠে বসে গাড়ীর মাথায়। বলে, সুজো তুমিও ওঠো না গাড়ীতে। এতোটা পথ মিছে হেঁটে যাবা কেন?

—না, আমি হেঁটেই যাবো নিতাই। তুমি গাড়ী চালাও!

গাড়ী চলছে! শহর পার হয়ে গাড়ী চলেছে মাঠের রাস্তায়। এঁটেল মাটির পথ! গাড়ী চলে চলে খাদের সৃষ্টি হয়েছে। সন্তর্পণে না চালালে নয়। এক ঘণ্টার পথ যেতে তিন ঘণ্টা লাগে। শীতের বেলা। মাঠের মধ্যেই সন্ধ্যে নামলো। এখনো অনেক পথ। দু'মাইল তো হবেই। কোঁচোর কাঁচোর শব্দ তুলে ককিয়ে ককিয়ে চলছে গরুর গাড়ী! নিতাই এক একবার ফিরে দেখছে রূপোকে! ছায়া মূর্তির মতো একভাবে বসে আছে রূপো! আর সুজয়েরও যেন কি হয়েছে. গাড়ীর পেছু পেছু হেঁটে আসছে নীরবে! এতোটা পথ এলো, কিন্তু একটি কথাও বলে নি! চরমুকুন্দপুরে পৌঁছনোর আগে রূপো ডেকে বলে নিতাইকে, সোজা বলাই ঠাকুরের বাড়ী নে চলো গাড়ী! ঠাকুরের পায়ের ধূলো না নে আমি কোথাও যাবো না।

এদিকে বলাই দুপুরে খেয়ে দেয়ে কামরায় ঢুকেছে, এখনো বাইরে আসে নি। মা দু'বার ডেকেছিল, সে ডাকেও সাড়া দেয় নি বলাই।

বলাই দাঁড়িয়ে আছে রূপোর মূর্তির সুমুখে! কানে গোঁজা রঙের তুলি। অপলক দৃষ্টিতে দেখছে নিজের সৃষ্টিকে! না, কোনো খুঁত নেই। চিবুকের নীচের তিলটিও স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। চোখ দু'টিও হয়েছে নিখুঁত। সদ্য রং করা পালিশ দেওয়া, তাই বোধহয় অমন ছল ছল করছে। করুক।

মাটি দিয়ে গড়া রূপোর মূর্তি। রং পালিশে তাকে জীবন্ত করে তুলেছে। সবই নিখুঁত, শুধু চোখ দু'টিতে যেন কান্নার রং।

আত্ম-সম্মোহিত বলাই-এর দু'চোখে জলবিন্দু চিক চিক করছে। শিল্পীর বেদনার প্রকাশ তার সৃষ্টিতে। সার্থক সৃষ্টি। তাই বোধ হয় শিল্পী বলাই-এর দু'টি চোখে বেদনার অশ্রুধারা।

রূপো। রূপসী রূপো! তারই মূর্তি, মাটি দিয়ে গড়া। তবু কেন বলাই-এর মনে বাসনা জাগে ওর রক্তিম ওষ্ঠে চুম্বন দিতে? মুহূর্তের ভগ্নাংশের চিন্তা। তবু কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বলাই। পরক্ষণে সামলে নেয় নিজেকে। ধিক্কার হানে। অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা অনুভব করে মনে। এতোদিন ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা ওই মূর্তিটাকে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু তা অসম্ভব। জীবনের গোপনে সুপ্ত ছিল আকাঙ্ক্ষা। এতোদিন যা অপ্রকাশিত ছিল, আজ তাই প্রকাশ পেয়েছে।

—ঠাকুর, ও ঠাকুর, দরজা খোলো।

রূপো ডাকছে, তবু অচঞ্চল দাঁড়িয়ে বলাই। আবার ডাকছে রূপো। আকুল তার কণ্ঠস্বর। ছেঁড়া মশারী ছিল, তাই দিয়ে তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলে রূপোর মূর্তি।

দরজা খোলে বলাই। যেন এক ঝলক আলো চোখের ওপর আছড়ে পড়লো। রূপো জড়িয়ে ধরেছে বলাই-এর দু'টি পা। শিশুর মতো ডুকরে কাঁদছে।

কি হোলো রূপোর? কাঁদছে কেন এমন করে? বলাই যেন পাথর হয়ে গেছে। এতো সময় দূরে দাঁড়িয়েছিল সুজয়, এগিয়ে এলো এবারে।

-ঠাকুর, বলো এবারে কি করবো? রূপোর কণ্ঠস্বরে আকুতি।

হাসি ফুটলো বলাই-এর মুখে। ইংগিতে সুজয়কে কাছে ডাকে। তারপর রূপোকে দু'হাতে তুলে ধরে বলে, তোমরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়াও রূপো, আমি দেখি সুজয়ের পাশে তোমাকে কেমন দেখায়।

পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে ওরা দু'জন। সুজয়-রূপো। বলাই মুগ্ধ হয়ে যায়। সুন্দর। চোখ জুড়িয়ে যায়, মন ভরে যায়।

—ও কে? আর্তনাদের মতো শোনায় রূপোর কণ্ঠস্বর।— ও কি করেছো ঠাকুর? বলে দু'হাতে মুখ ঢাকে রূপো।

রূপোর মূর্তি থেকে খসে গেছে মশারীর আবরণ। তাড়াতাড়িতে ভালো করে ঢাকা হয় নি। শুধু রূপো নয়, সুজয়ের দৃষ্টিও নিবদ্ধ রূপোর মূর্তির ওপর।

বলাই-এর মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসি।—সুজয় আর রূপোর মাঝখানে হাইফেনের মতো দাঁড়িয়ে থেকে বলে, ওকে তোমরা চিনতে পারলে না!